সম্পাদকীয়

সার্বভৌমত্ব রক্ষায় জঙ্গিবাদ-সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্য অপরিহার্য

বর্তমান সময়ে চলমান মহা সংকটের পরিধিকে একত্রে চিন্তা করতে গেলে কোনো বিবেকবান চিন্তাশীল মানুষ স্থির থাকতে পারে না। মানবজাতি তার ভিতরে, আত্মিকভাবে দেউলিয়া, বাইরে সর্বপ্রকার বিপর্যয়ের শিকার। কারো কোনো নিরাপত্তা নেই, চরম অর্থনৈতিক বৈষম্য বিরাজ করছে, শোষণমূলক পুঁজিবাদ মাত্র আটজন ব্যক্তির হাতে পৃথিবীর অর্ধেক জনগোষ্ঠীর সম্পদ তুলে দিয়েছে, দুর্বৃত্তরা সম্মানের আসন পাচ্ছে, শিক্ষক ছাত্রের হাতে মার খাচ্ছে, সৎ ব্যক্তি জীবনমানের ঊর্ধ্বশ্বাস দৌড়ে সর্বত্র পিছিয়ে পড়ছে। দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচারে, দরিদ্রের ওপর ধনীর বঞ্চনায়, শোষণে, শাসিতের ওপর শাসকের অবিচারে, ন্যায়ের ওপর অন্যায়ের বিজয়ে, সরলের ওপর ধুর্তের বঞ্চনায়, পৃথিবী আজ মানুষের বাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। এর ওপর আবার ভয়াবহ বিপদ দাঁড়িয়েছে পারমাণবিক অস্ত্রের যা যে কোনো মুহূর্তে সমস্ত মানবজাতিসহ পৃথিবী নামক গ্রহটাকেই ভেঙে ফেলতে সক্ষম।

আমাদেরকে যেমন মানবজাতি সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে তেমনি বাঙালি জাতিকে নিয়েও চিন্তা করতে হবে, মুসলমান সম্প্রদায়কে নিয়েও চিন্তা করতে হবে। বাংলাদেশের বাসিন্দাদের উদ্বিগ্ন হওয়ার বড় কারণ হচ্ছে এ দেশের ৯০% জনগণ ধর্মীয় পরিচয়ে মুসলমান আর পরাশক্তিধর রাষ্ট্রগুলো চলমান সভ্যতার সংঘাতে (The Clashes of civilizations) একটার পর একটা মুসলিমপ্রধান দেশ ধ্বংস করছে, দখল

সূচিপত্র

- *স্বাধীনতার শিক্ষা* ৩
- *যে কারণে আমরা স্বজাতি* ৬
- *বিকৃত ইসলাম ও প্রকৃত ইসলামের মধ্যে সীমারেখা টানতে হবে* ১০
- *বাংলার সুফি সাধকরা কেমন ছিলেন?* ১১
- *আকিদা-ঈমান-আমল* ১৩
- *ইসলাম প্রত্যাশীদের করণীয়*..... ১৫
- *মো'মেন কখনও যুক্তিবোধহীন হতে পারে না* ১৬
- *জাতি পথ হারাল যেভাবে* ২০
- *ট্রাম্প কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন বিশ্বকে?* ২৪
- *দোয়া ব্যর্থ হয় কেন?* ২৮
- *দুনিয়াবিমুখ ধার্মিকতা ইসলামের শিক্ষা নয়* ৩১

প্রকাশক ও সম্পাদক: এস এম সামসুল হুদা ১৩৯/১, তেজকুনী পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ কর্তৃক মানিকগঞ্জ প্রেস, ৪৪ আরামবাগ, মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। **উপদেষ্টামণ্ডলী:** মসীহ উর রহমান, উম্মুত তিজান মাখদুমা পন্নী, রুফায়দাহ পন্নী, **বার্তা ও বাণিজ্যিক কার্যালয়:** ২২৩, মধ্য বাসাবো, সবুজবাগ, ঢাকা- ১২১৪, ০২-৭২১৮১১১, ০২-৮১১৯০৭৬, ০১৭৭৮-২৭৬৭৯৪, **বিজ্ঞাপন বিভাগ:** ০১৮১৬৭১২১৫৮ **ওয়েব:** www.bajroshakti.com **ই-মেইল:** bajroshakti@gmail.com

করে নিচ্ছে, তাদের লক্ষ লক্ষ মানুষ হত্যা করছে, কোটি কোটি জনগণকে উদ্বাস্তু করছে। ১৯৭১ এ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে আমরা যে স্বাধীন ভূখণ্ড লাভ করেছি সেই প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশকেও যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করার অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র চলমান আছে। বর্তমানে বিশ্বে ধর্ম প্রধান ইস্যু, ইউরোপ আমেরিকার দেশগুলো ধর্মবিশ্বাস ও ইসলাম-বিদ্বেষকে রাজনৈতিক ট্রাম্প কার্ড হিসাবে ব্যবহার করছে। এই ধর্ম সংক্রান্ত সংকট থেকে জাতিকে রক্ষা করতে হলে ধর্ম নিয়ে এখন সবাইকে কথা বলতে হবে, নইলে দেশ রক্ষা করাই মুশকিল হয়ে যাবে। যেভাবে আজ আকাশ থেকে বোমা ফেলে, মিসাইল ছুঁড়ে ইরাকসহ একটার পর একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রকে নানা প্রকার অজুহাত দাঁড় করিয়ে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে তাতে ব্যক্তি স্বাধীনতা দূরের কথা, দেশ রক্ষার ক্ষেত্রে কোনো রাষ্ট্রের সীমানারও বিশেষ কোনো তাৎপর্য আর থাকে না। কেবল চোরাকারবারীদের মাদকদ্রব্য, গরু ইত্যাদি পাচার নিয়ন্ত্রণ এবং অবৈধ অভিবাসী আখ্যা পাওয়া উদ্বাস্তু অসহায় জনতাকে বাধা দেওয়ার কাজে সীমান্ত কাঁটাতার ব্যবহৃত হচ্ছে। রেনেসাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত কথিত সভ্য রাষ্ট্রগুলো সম্মিলিতভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কোটি কোটি মানুষ হত্যা করার মধ্য দিয়ে যে ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ ঘটিয়েছে তার পর যে স্বপ্ন নিয়ে বস্তুবাদী দর্শনের রেনেসাঁ ঘটেছিল সেই স্বপ্ন ধূলায় মিশে যায়। আর কোনো মানবতাবাদী শান্তিদায়ক আদর্শ পৃথিবীতে আধিপত্য করছে না, কেবল চলছে জবরদস্তিমূলক শাসন (Might is right), পারমাণবিক অস্ত্রের শাসন।

জঙ্গিবাদ ইস্যুটি একটি অতি কার্যকর পন্থা যাকে দক্ষতার সাথে ব্যবহার করে যুদ্ধক্ষেত্র তথা অস্ত্রের বাজার সম্প্রসারণ করে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়ার মতো রাষ্ট্রগুলো। জঙ্গিগোষ্ঠীগুলোকে তারাই কয়েকটি ধর্মব্যবসায়ী আরব রাষ্ট্রের সহযোগিতায় প্রয়োজনীয় শত্রুরূপে (Useful Enemy) সৃষ্টি করছে। অনেকেই জঙ্গিবাদের উৎপত্তির দায় কোর'আনের উপর চাপাতে ব্যস্ত থাকেন। অথচ জেহাদ আর সন্ত্রাস সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। প্রতিটি মানুষকে এখন এই ফারাক বুঝতে হবে যেন কেউ কোর'আন দেখিয়ে জেহাদের কথা বলে কাউকে সন্ত্রাসে লিপ্ত করতে না পারে। একইভাবে ধর্মীয় জনগোষ্ঠীকে উস্কানি দিয়ে ক্ষেপিয়ে তুলে দাঙ্গাময় পরিস্থিতি (Mob) সৃষ্টি করা, অপর কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর উপর ধর্মের নামে নৃশংস চালানো আর ইসলামের জেহাদ-কেতাল এক বিষয় নয়, এদের মধ্যে সামান্যতম সংশ্লিষ্টতাও নেই। **কেবল মানুষের অজ্ঞতাকে পুঁজি করেই ধর্মব্যবসায়ী গোষ্ঠী ফতোয়াবাজি করে উশৃঙ্খল জনতাকে 'তওহীদী জনতা' আখ্যা দিয়ে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক হামলা চালায়।** আবার ভিন্নমতের মানুষকে গুপ্তহত্যা করারও কোনো বৈধতা আল্লাহ-রসুলের ইসলাম দেয় না। তবু জেহাদের নাম দিয়ে সেটা বেশ জোরেসোরেই চালিয়ে আসছে কিছু গোষ্ঠী। ধর্মের নামে চলা এসব ভয়ঙ্কর অপকর্ম ইসলামের বিরুদ্ধে মানুষের মনকে দিন দিন বিষিয়ে তুলছে, মুসলিমদেরকে ঘৃণার পাত্রে পরিণত করছে। আমরা হেযবুত তওহীদ অকাট্য যুক্তি, দলিল ও প্রমাণ সহকারে এসবের বিরুদ্ধে আদর্শিক লড়াই করে যাচ্ছি, যেন এসব ভ্রান্ত ব্যাখ্যার বিষয়ে এ দেশের আপামর ধর্মবিশ্বাসী জনগোষ্ঠী সোচ্চার হয়। আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলছি, এগুলো একটাও ইসলাম নয়। দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য ষোল কোটি বাঙালিকে একটি ইস্পাতকঠিন ঐক্যবদ্ধ জাতি গড়ার প্রত্যয় নিয়ে প্রকাশিত হলো দৈনিক বজ্রশক্তির এবারের সংকলন।

বর্তমানে বিশ্বে ধর্ম প্রধান ইস্যু, ইউরোপ আমেরিকার দেশগুলো ধর্মবিশ্বাস ও ইসলাম-বিদ্বেষকে রাজনৈতিক ট্রাম্প কার্ড হিসাবে ব্যবহার করছে। এই ধর্ম সংক্রান্ত সংকট থেকে জাতিকে রক্ষা করতে হলে ধর্ম নিয়ে এখন সবাইকে কথা বলতে হবে, নইলে দেশ রক্ষা করাই মুশকিল হয়ে যাবে।

স্বাধীনতার শিক্ষা

রাকীব আল হাসান

স্বাধীনতার মাস মার্চ। বাঙালি জাতির জন্য এ এক গৌরবের মাস। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ আমরা দীর্ঘসময়ের পরাধীনতার গ্লানি ঘুচিয়ে স্বাধীনতার সুধা পান করি। দীর্ঘদিনের শোষণ, নিপীড়ন, নির্যাতন আর গোলামির হাত থেকে বাঁচার যে সম্ভাবনা সেদিন সৃষ্টি হয় তা নয় মাস যুদ্ধ করে ৩০ লক্ষ তাজা প্রাণ আর ৩ লক্ষ মা-বোনের সম্মান বিসর্জন দিয়ে অর্জিত হয় ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরে।

সুলতানি আমল পর্যন্ত এই বঙ্গভূমি স্বাধীন ছিল। টাঙ্গাইলের করটিয়ার ঐতিহ্যবাহী পন্নী (পূর্বে এই বংশের নাম ছিল কাররানি) পরিবারের উত্তরসূরি সুলতান দাউদ খান কাররানি ছিলেন বাংলার সর্বশেষ স্বাধীন সুলতান। ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে রাজমহলের যুদ্ধে এই বঙ্গভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তিনি জীবন দেন। সুলতান দাউন খান কাররানির আমলে স্বাধীন সুলতান হিসাবে তার নামেই খুতবা পাঠ করা হতো এবং তার নামেই মুদ্রা প্রচলিত ছিল। ঐতিহাসিক বিচারে এই দাউদ খান পন্নীই বাংলার ইতিহাসে সর্বশেষ স্বাধীন শাসনকর্তা ছিলেন। পন্নী রাজবংশের পরাজয়ের পর বারো ভূঁইয়াখ্যাত পন্নীদের অনুগত দৃঢ়চেতা কমান্ডার ও জমিদারগণ দিল্লির কেন্দ্রীয় সরকারকে অস্বীকার করে আঞ্চলিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করলেও পরে অবশ্য তারাও মোঘলদের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হন। অর্থাৎ পরবর্তী সময়ে এই বঙ্গভূমি পরিচালনা করেছে মোঘল সম্রাটদের অধীনস্ত ও মোঘল সম্রাট কর্তৃক নিয়োগকৃত সুবেদার ও নবাবগণ (নায়েব)। ১৭৫৭ সালের পলাশী যুদ্ধে নবাব সিরাজ উদ্দৌলার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে নবাবী আমলের কার্যত পতন ঘটে এবং বাংলা চলে যায় ব্রিটিশদের অধীনে। শুরু হয় অবর্ণনীয় শোষণ আর নির্যাতন। তাদের শোষণের ফলেই ছেয়াত্তরের মনন্তরে এ অঞ্চলের এক-তৃতীয়াংশ মানুষ মারা যায়, জীবিত মানুষ মৃত মানুষের গোস্ত ভক্ষণ করে। এভাবে চলে প্রায় দু'শ বছরের অত্যাচার আর শোষণের যুগ। পৃথিবীর সবচেয়ে সমৃদ্ধ অঞ্চলকে শোষণ করে চরম দারিদ্র্যে নিমজ্জিত করে ১৯৪৭ সালে তারা এ অঞ্চল ছেড়ে চলে যাবার সময় এ অঞ্চলের মানুষ যেন একদিনের জন্যও ঐক্যবদ্ধ হতে না পারে সেজন্য তারা বেশকিছু শয়তানী চক্রান্ত করে রেখে গেল, তার মধ্যে ভৌগোলিকভাবে বাংলাকে পাকিস্তানের অধীন করা,

ষড়যন্ত্রমূলক শিক্ষাব্যবস্থা, রাজনৈতিক ঐক্যবিনাশী ব্যবস্থা ও হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ অন্যতম। তারা বাংলাদেশকে স্বাধীনতা না দিয়ে পাকিস্তানের অধীন করে রেখে গেল ফলে ব্রিটিশ শাসনের মতোই শোষণ আর নির্যাতন চলতে থাকল। এ অঞ্চলের হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে এমন বিদ্বেষ সৃষ্টি করে দিয়ে গেল যেন মুসলিম ও হিন্দুরা একে অপরকে শত্রু গণ্য করে। সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যমে জাতিকে মনস্তাত্ত্বিকভাবে দু'টি ভাগে ভাগ করে ফেলল। আবার মাদ্রাসাশিক্ষিতদের মাধ্যমে নানা মাজহাব-ফেরকার যে দ্বন্দ্ব আগে থেকেই ছিল তা আরও বেশি করে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে গেল। আর রাজনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে বহু দল-মতে যেন আমরা বিভক্ত থাকি তার ব্যবস্থাও করে দিয়ে গেল।

ঐক্য অনৈক্যের উপর জয়লাভ করবে এটি একটি প্রাকৃতিক নিয়ম। এটা যেমন কোনো পরিবারের জন্য সত্য তেমনি একটি জাতির জন্যও সত্য। একটি জাতির মানুষগুলো যদি ঐক্যবদ্ধ হয় তাহলে তারা যে কোনো লক্ষ্য অর্জন করতে পারে। এর উদাহরণ ১৯৭১। ব্রিটিশদের বিদায়ের পর থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানি শাসকরা এ দেশের মানুষের উপর যে শোষণ, নির্যাতন চালিয়েছিল তার বিরুদ্ধে এদেশের কৃষক, তাঁতি, মুটে, ছাত্র, শিক্ষকসহ সর্বস্তরের জনগণ সেদিন শান্তিময় দেশের স্বপ্ন বুকে নিয়ে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এবং প্রশিক্ষিত সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে স্বাধীনতার সূর্যকে ছিনিয়ে এনেছিল। এই বিরাট অর্জন সম্ভব হয়েছিল কারণ এ জাতিটি তখন একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী ৪৬ বছরে সেই ঐক্য আমরা দুর্ভাগ্যক্রমে ধরে রাখতে পারি নি। ধর্মব্যবসায়ী শ্রেণির ফতোয়াবাজি, অপরাজনীতি আর পশ্চিমা পরাশক্তিগুলোর ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে হাজারো ভাগে বিভক্ত ও হানাহানি, মারামারি, দলাদলি, হত্যা-রক্তপাতে নিমজ্জিত হয়ে গেছি। আজও আমরা তৃতীয় বিশ্বের পশ্চাৎপদ একটি দরিদ্র দেশ। কিন্তু ৪৬ বছর যদি আমরা একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসাবে থাকতাম, তবে আমরা নিঃসন্দেহে সর্বদিক দিয়ে পৃথিবীর একটি শীর্ষস্থানীয় জাতিতে পরিণত হতাম। সেই অতীতের ব্যর্থতাকে পেছনে ফেলে আজ যদি আমরা নতুন করে সিদ্ধান্ত নেই যে, আমরা এ জাতিটিকে পৃথিবীর অন্যতম সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী জাতিসত্তায় পরিণত করে স্বাধীনতাকে সার্থক করব, তাহলেও আমাদেরকে সেই প্রাকৃতিক নিয়মটি কাজে লাগাতে হবে-অর্থাৎ আমাদেরকে একাত্তরের ন্যায় ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ষোল কোটি বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

এ ঐক্যের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে ধর্মব্যবসা, ধর্ম নিয়ে অপরাজনীতি ও বৈদেশিক ষড়যন্ত্র। বিভিন্ন ইস্যুকে কেন্দ্র করে আমাদের দেশে প্রায়ই ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়। ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি রাজনৈতিক অস্থিরতায় গোটা দেশে গৃহযুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল, জীবনযাত্রা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেসময় রাজনীতি ও ধর্মের দোহাই দিয়ে শত শত মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আহত, পঙ্গু, অগ্নিদগ্ধ হয়েছে হাজার হাজার মানুষ, কেটে ফেলা হয়েছে হাজার হাজার গাছ, পোড়ানো হয়েছে বহু ঘর-বাড়ি, যান-বাহন। রেল ও সড়ক যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেছে। জাতীয় রাজনীতিতে আন্দোলনের নামে সহিংসতা সৃষ্টির যে ধারা আমাদের দেশে চালু আছে তার খেসারত দিতে হয় সাধারণ মানুষকেই। তাই সাধারণ মানুষকেই সচেতন হতে হবে ভবিষ্যতে তাদের জীবনে যেন আর এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়। একইসাথে দেশ ধ্বংসকারী একটি ইস্যু হলো জঙ্গিবাদ। জঙ্গিবাদে আক্রান্ত হয়ে একটির পর একটি মুসলিম দেশ ধ্বংস হয়ে গেছে। আমাদের দেশেও গত কয়েক বছর থেকে জঙ্গি তৎপরতা যেভাবে বেড়ে গেছে তাতে বোঝাই যাচ্ছে যে দেশকে ধ্বংস করার জন্য দেশি-বিদেশি একটি মহল ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে। এখন এই অবস্থা থেকে দেশকে রক্ষা করতে হলে জনগণকে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস, অপরাজনীতি, ধর্মব্যবসা, রাজনীতিক সহিংসতাসহ যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী সংখ্যায় যত বৃহৎই হোক তারা প্রকৃতপক্ষে হয় শক্তিহীন। জনগণের অনৈক্যের সুযোগ নিয়েই কতিপয় সুবিধাবাদী দুস্কৃতকারী যুগের পর যুগ মানবসমাজে অশান্তি সৃষ্টি করে যায়। কিন্তু আর নয়। ষোলো কোটি মানুষ যদি সর্বপ্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে তাহলে গুটিকয় দুস্কৃতকারী আর দেশকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিতে পারবে না।

এখন আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ হতে পারি তাহলে আমরা এমন একটি সমাজ পাব যেখানে কোনো জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস, হানাহানি থাকবে না, চুরি-ছিনতাই থাকবে না, কোনো দুর্নীতি, প্রতারণা থাকবে না, অন্যের অধিকার কেউ হরণ করবে না, নারী নির্যাতন, সাম্প্রদায়িকতা থাকবে না। দু'জন মানুষের ঐক্য যেমন পরিবারকে শান্তিময় করে, তেমনি ষোলো কোটি মানুষের ঐক্য সমাজ ও দেশকে শান্তিময় করবে।

আমাদেরকে অবশ্যই ন্যায়-সত্যের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। অন্যায়, অসত্য, বিভক্তি সৃষ্টিকারী উপাদানগুলো যথা ধর্মব্যবসা, অপরাজনীতি, পশ্চিমা সভ্যতার চাপিয়ে দেওয়া ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে কারণ কোনো অন্যায়, অসভ্যতা, মিথ্যা মানুষকে শান্তি দিতে পারে না। আমরা সমস্ত মানবজাতি একই স্রষ্টার সৃষ্টি, একই পিতা-মাতা আদম হাওয়ার সন্তান। সুতরাং আমরা এক পরিবার, আমরা প্রত্যেকে ভাই-ভাই। তাই আমাদের মধ্যে ধর্মীয় বা রাজনীতিক কোনো বিভক্তি থাকা যুক্তিসঙ্গত নয়। বিভক্তি স্রষ্টার কাম্যও নয়। তাই সকল ধর্মেই

আছে ঐক্যের শিক্ষা। কিন্তু ধর্মব্যবসায়ীরা নিজেদের স্বার্থে ধর্মকেই বিভেদের প্রাচীরে রূপ দিয়েছে।

আজ আমরা ধর্ম বলতে বুঝি কিছু আনুষ্ঠানিক উপাসনা। কিন্তু ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা হচ্ছে মানবতা, সেটা আমরা ত্যাগ করেছি। কোনো বস্তুর মৌলিক বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে তার ধর্ম। যেমন আগুনের ধর্ম পোড়ানো। তেমনি মানুষের প্রকৃত ধর্ম হচ্ছে মানবতা। এশিয়ার একজন মানুষ আফ্রিকার অনাহারী মানুষটির কথা ভেবে দুঃখিত হবে, একটি বাড়িতে আগুন লাগলে সে আগুন নেভাবে, সে বিবেচনা করবে না ঐ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিটি কোন ধর্মের। ফিলিস্তিনে একটি শিশু বোমার আঘাতে প্রাণ দিলে সমগ্র মানবজাতির হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হবে, এটাই মানুষের ধর্ম। আর এ ধর্ম পালন করাই মানুষের প্রকৃত এবাদত। মানবজাতিকে অশান্তির মধ্যে ফেলে রেখে মসজিদ, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডার চার দেওয়ালের মধ্যে প্রার্থনায় মশগুল থাকলে স্রষ্টা আমাদের উপর সন্তুষ্ট হবেন না, পরকালেও মুক্তি মিলবে না। আল্লাহর সন্তুষ্টি তারাই লাভ করেন যারা সমাজ থেকে অন্যায়, অবিচার, যুদ্ধ, রক্তপাত, ক্ষুধা, ক্রন্দন- এক কথায় অশান্তি দূর করার জন্য সংগ্রাম করে যান। নবী-রসুল-অবতারগণ ঐ লক্ষ্যেই সংগ্রাম করে গেছেন।

মুসলিম-সনাতন-বৌদ্ধ-খ্রিস্টানসহ সকল ধর্মের অনুসারীদেরকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দিয়েছেন এ যামানার এমাম, এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী। তিনি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মানুষকে তাদের ধর্মের মৌলিক শিক্ষা 'নিঃস্বার্থ মানব কল্যাণই ধর্ম' এই মহাসত্যের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হতে আহ্বান করেছেন। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, এই সমাজে আমরা বড় হয়েছি, এ সমাজের প্রতি আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব রয়েছে। আমাদেরকে স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা পরিহার করতে হবে। যে শুধু নিজের স্বার্থে কাজ করে, মানুষের কল্যাণের জন্য একটি কুটাও নাড়তে চায় না, একটা টাকা খরচ করতে চায় না- সে তো মানুষ নয়, সে পশুরও অধম। মানবজাতির কল্যাণে নিজেদের জীবন ও সম্পদকে উৎসর্গ করতে পারার মধ্যেই নিহিত আছে মানবজন্মের সার্থকতা। একাত্তরে মুক্তিযোদ্ধারা যেমন নিঃস্বার্থভাবে মাতৃভূমির মুক্তির জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, আজ ৪৬ বছর পরে আবারও প্রয়োজন একটি শান্তিময়, ন্যায়বিচারপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠায় নিঃস্বার্থ আত্মনিয়োগের।

স্বাধীনতার এই মাসে বহু অনুষ্ঠান হবে, বহু সেমিনার হবে, নানা আয়োজনে পালন করা হবে স্বাধীনতা দিবস কিন্তু স্বাধীনতার ঘোষণার পর এই ঘোষণাকে বাস্তবায়নের জন্য যে নিঃস্বার্থ, আত্মত্যাগী ঐক্যবদ্ধ মানুষগুলো নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে এই স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছিল তাদের জীবন থেকে আমরা কতটুকু শিক্ষা নিতে পারব সেটাই এখন প্রশ্ন। তাদের আত্মত্যাগকে কেবল দিবস পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে আমরাও যদি তাদের মতো দেশ ও দেশের মানুষের জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়ে জীবন উৎসর্গ করতে পারি তবেই তাদের আত্মত্যাগ সার্থক হবে। আসুন আমরা এই স্বাধীনতার মাসে যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নতুনভাবে দেশ গড়ার শপথ নেই।

লেখক: শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক, হেযবুত তওহীদ

ইসলামের প্রকৃত রূপরেখা

কেন উম্মতে মোহাম্মদীর সৃষ্টি ও উত্থান হয়েছিল, কেমন ছিলেন সেই বিশ্বজয়ী উম্মাহ, কি ছিল তাদের আকিদা, কিভাবে আইয়্যামে জাহেলিয়াতের বর্বরতার গভীর অন্ধকার থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে সামরিক শক্তিতে বিশ্বের শিক্ষকের আসনে আসীন হল একটি জাতি? আর আজ কেন সেই জাতি বিশ্বের সকল জাতির গোলাম? দুনিয়াজোড়া কেন এই দুর্গতি? কিভাবে এই অশান্তি থেকে জাতির পরিত্রাণ ঘটবে এমন সব যুগান্তকারী প্রশ্নেরই কোর'আন, হাদিস ভিত্তিক অখণ্ডনীয় জবাব পেশ করা হয়েছে এই বইটিতে।

তওহীদ প্রকাশন
৩১/৩২, পি.কে.রায় রোড, পুস্তক ভবন, বাংলাবাজার, ঢাকা

WWW.HEZBUTTAWHEED.ORG
01782188237 | 01670174643 01711005025 | 01933767725

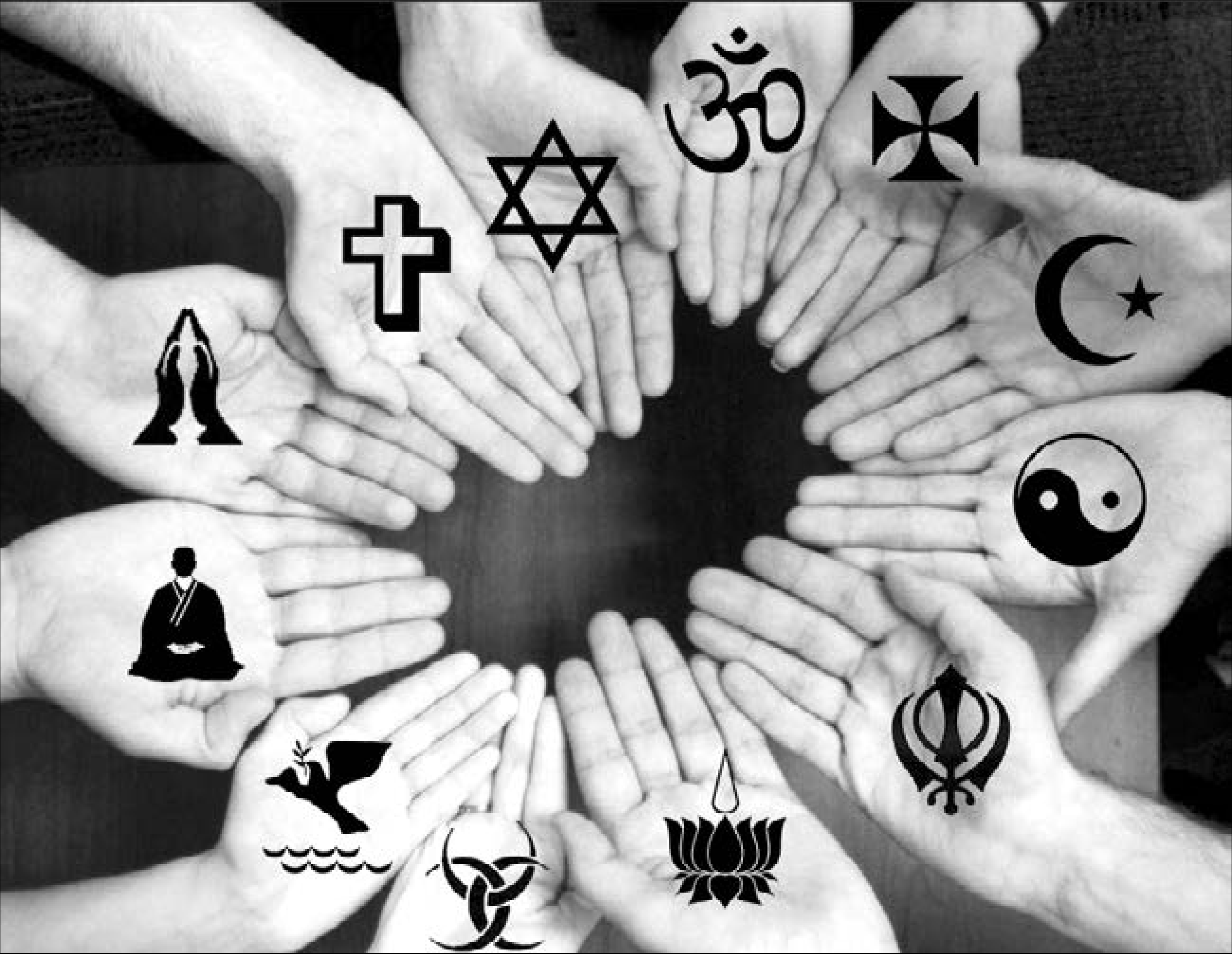

যে কারণে আমরা স্বজাতি

রিয়াদুল হাসান

খ্রিষ্টানদের সাথে মুসলিমদের সহস্র বছরের বিরোধের পেছনে রাজনৈতিক স্বার্থবাদীদের চক্রান্ত প্রধান হলেও ধর্মীয় বিশ্বাসের তারতম্যও যথেষ্ট বিবেচনার দাবি রাখে। কিন্তু আদতে খ্রিষ্টান ও মুসলিম ভিন্ন জাতি নয়। মুসলিমরা যেমন আল্লাহ তথা ঈশ্বরের প্রেরিত নবী মোহাম্মদের (সা.) অনুসারী, তেমনি খ্রিষ্টানরাও ঐ ঈশ্বরেরই প্রেরিত অপর এক নবী যিশু তথা ঈসার (আ.) অনুসারী বলে নিজেদের বিশ্বাস করে। খ্রিষ্টান ও মুসলিম উভয়েই একই স্রষ্টার সৃষ্টি, একই মাতা-পিতার সন্তান। ইসলাম ধর্মে তাদেরকে বলা হয়েছে আদম-হাওয়া, আর বাইবেলে বলা হয়েছে অ্যাডাম-ইভ। খ্রিষ্টানরা যাকে বলেন জেসাস-ক্রাইস্ট, মুসলিমরা তাঁকেই বলেন ঈসা (আ.)। যিশু খ্রিষ্টকে (আ.) সম্মান করা, তাঁকে নবী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া শুধু একজন মুসলিমের কর্তব্যই নয়, ঈমানী দায়িত্ব। কোনো মুসলিম যদি তাঁকে অস্বীকার করে তবে সে কাফের হবে, কারণ তাঁকে অস্বীকার করলে প্রকারান্তরে স্রষ্টাকেই অস্বীকার করা হয় (সুরা নেসা-১৫১)।

ঈসা (আ.) আল্লাহর তওহীদ তথা একত্ববাদ শিক্ষা দিয়েছেন। বাইবেলে আমরা পাই, একদিন একজন লোক তাঁর কাছে জানতে চাইলো, সকল অনুশাসনের (Commandment) মধ্যে সর্বপ্রথম অনুশাসন কি? ঈসা (আ.) উত্তরে বললেন, "শোন হে বনী ইসরাইল। সর্বপ্রথম অনুশাসন হচ্ছে আমাদের প্রভু আল্লাহ হচ্ছেন একমাত্র প্রভু" (The first of all the commandments is, Hear, O Israel; The Lord our God is one Lord. :The 12th chapter of Mark)। মুসলিমদের বিশ্বাসও তাই। যারা খ্রিষ্টান দাবিদার কিন্তু না মানে ইঞ্জিলের বিধান, না মানে ঈসা (আ.) এর উপদেশ এক কথায় যারা স্রষ্টার বিধান মানে না তারা আসলে ঈসা (আ.) এর অনুসারী নয়, যতই তারা দাবি করুক। তেমনিভাবে যারা না মানে কোর'আনের বিধান, না অনুসরণ করে শেষ নবীর আদর্শ, তারা মুসলিম বংশোদ্ভূত হলেও মুসলিম নয়, উম্মতে মোহাম্মদী নয় যতই দাবি করুক না কেন।

বাইবেল বলছে যিশু খ্রিষ্ট আবার আসবেন, হাদিসেও

বলা আছে তিনি আবার আসবেন এবং এসে দাজ্জাল ধ্বংস করবেন। খ্রিষ্টানরা অপেক্ষা করছেন- যিশু খ্রিষ্ট এসে এন্টি ক্রাইস্ট ধ্বংস করবেন, 'কিংডম অব হ্যাভেন' প্রতিষ্ঠা করবেন; মুসলিমরাও অপেক্ষা করছেন- ঈসা (আ.) পৃথিবীতে এসে দাজ্জালকে ধ্বংস করে এমন শান্তি প্রতিষ্ঠা করবেন যে, নেকড়ে আর ভেড়া এক সাথে থাকবে। তাহলে মুসলিম ও খ্রিষ্টানদের মধ্যে পার্থক্য রইল কোথায়? উভয় জাতির মধ্যে শত্রুতার কোনো ভিত্তি রইল কি?

পবিত্র কোর'আনে সুরা নেসার ১৫৯ নং আয়াতে আল্লাহ পাক বলেছেন, "আহলে কিতাবদের প্রত্যেকে তাদের মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার [ঈসা (আ.) এর] উপর ঈমান আনবেই।" কেয়ামতের পূর্বে সমগ্র মানবজাতি স্রষ্টার সিদ্ধান্তের প্রতি আত্মসমর্পণ করবে এবং মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে একজাতিতে পরিণত করার জন্যই ঈসা (আ.) এর পুনরাগমন হবে। সুতরাং এটাই যদি তাঁর কাজ হয় তবে কেন আমরা মিছেমিছি সেই ঐক্যকে বিলম্বিত করছি, আজই কেন আমরা এক জাতিতে পরিণত হতে পারছি না? যেহেতু ঈসা (আ.) এসে বাইবেলে বর্ণিত Anti-Christ, The Beast, হাদীসে বর্ণিত দাজ্জালকে ধ্বংস করে সমস্ত মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করবেন যার ফলস্বরূপ পৃথিবী হবে Kingdom of Heaven, সেহেতু আমরা সেই ঐক্য প্রক্রিয়া এখনই কেন শুরু করি না?

রসুলাল্লাহ (স.) মক্কা বিজয়ের পর যখন কাবা ঘরে স্থাপিত বিভিন্ন দেব দেবীর মূর্তি ভেঙে ফেলছিলেন তখন কাবার অভ্যন্তরভাগের দেওয়ালে যিশু খ্রিষ্ট ও মা মেরির ছবিও ছিল। আল্লাহর রসুল সকল মূর্তি ভাঙলেও, সকল ছবি ধুয়ে ফেললেও ঐ ছবিটা নষ্ট করলেন না। কয়েক শতাব্দী ঐ ছবি সেখানেই ছিল। পরে কাবাঘর পুনঃসংস্কার করার সময় সেই ছবিগুলি নষ্ট হয়ে যায় (সূত্রঃ সিরাত ইবনে ইসহাক)। যে ছবি আল্লাহর ঘর কাবায় ছিল সে ছবি কারও ঘরে কেউ যদি রাখতে চায় তবে অন্যের আপত্তি থাকার কথা নয়। তিনি তো কেবল খ্রিষ্টানদেরই নবী নন, মুসলিমদেরও নবী। শেষ নবীর পূর্ববর্তী নবী-রসুলগণ কোনো নির্দিষ্ট জনপদে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর প্রতি প্রেরিত হলেও তাঁরা সমগ্র পৃথিবীর সম্পদ, সমগ্র মানবজাতির সম্পদ। এজন্য তাঁদের অনেকের ইতিহাস শেষ গ্রন্থে তাঁরা যে বিধান এনেছেন স্থান-কাল-পাত্রভেদে সেগুলোতে শরিয়াহর কিছু রদ-বদল থাকলেও মূল শিক্ষায় কোনো পার্থক্য ছিল না। কারণ, পৃথিবীর সত্য, শাশ্বত, সনাতন নিয়ম-নীতির কোনো পরিবর্তন হয় না। এই শাশ্বত শিক্ষা যেমন আল কোর'আনে আছে, তেমন বাইবেলেও আছে। কাজেই মুসলিমরা কোর'আনের পাশাপাশি বাইবেল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবেন, ইঞ্জিলের বহু কথা আল্লাহ কোর'আনেও উল্লেখ করেছেন। তেমনি খ্রিষ্টানরাও বাইবেলের পাশাপাশি কোর'আন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবেন এমনটাই হওয়া উচিত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মুসলিম ও খ্রিষ্টানদের মধ্যে কার্যত হিংসা, বিদ্বেষ, যুদ্ধ, হানাহানি তথা শত্রুতার যুক্তিসঙ্গত ধর্মীয় কোনো কারণ নেই।

ইব্রাহীম (আ.) তথা আব্রাহামকে মুসলিমরা জাতির পিতা বলে মান্য করেন। আল্লাহ উম্মতে মোহাম্মদীর উদ্দেশে পবিত্র কোর'আনে বলছেন, "এটাই (ইসলাম) তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের দীন। আল্লাহ্ তোমাদের নাম রেখেছেন 'মুসলিম'। পূর্বের গ্রন্থাবলীতেও আবার এই গ্রন্থেও (কোর'আন) ঐ নামই দেয়া হয়েছে (সুরা হজ ৭৮)।

তেমনি খ্রিষ্টানরাও ইব্রাহিমকেই (আ.) জাতির পিতা বলেই মান্য করেন। বাইবেলে বলা হচ্ছে: Abraham is "the father of all those who believe", both of the circumcised and the uncircumcised (Rom 4:9-12). অর্থাৎ আব্রাহাম খাৎনাকারী এবং খাৎনা বিহীন নির্বিশেষ সকল বিশ্বাসী মানুষের পিতা। ঈসা (আ.) তাঁর অনুসারীদের বলছেন, "If you were Abraham's children, then you would do what Abraham did. (John 8:39) অর্থাৎ যদি তোমরা ইব্রাহীমের সন্তান হয়ে থাকো তবে সেই কাজই তোমাদের কর্তব্য যা ইব্রাহীম করেছেন। সুতরাং এদিক দিয়েও মুসলিম-খ্রিষ্টান একই পিতার দুই পুত্র।

এই যদি হয় মুসলিমদের সাথে খ্রিষ্টানদের সম্পর্ক তাহলে এ দুই জাতির মধ্যে এত বিভেদ কেন? আমরা কি আজও এক সাথে বসতে পারি না? শত শত বছর ধরে বহু সংঘাত হয়েছে, শত্রুতা হয়েছে, ক্রুসেড সংঘটিত হয়েছে, কিন্তু কী লাভ হয়েছে? শান্তি এসেছে কি? শান্তি তো আসেই নি, মাঝখান থেকে ধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য, ধর্মের আত্মা তথা মানবতাটাই হারিয়ে গেছে। তাই আসুন আমরা ভাই ভাই হয়ে যাই। নবী-রসুলগণ যখন একজন আরেকজনকে ভাই বলে সম্বোধন করেছেন, সেই নবীদের অনুসারী হয়ে আমরা কেন একে অপরের সাথে শত্রুতা করব? ঈসা (আ.) সম্পর্কে আল্লাহর শেষ রসুল (সা.) বলেছেন, "মানবজাতির মধ্যে সবার চেয়ে ঈসা ইবনে মারিয়ামের (আ.) ভাই হবার ক্ষেত্রে আমি সর্বাধিক দাবিদার, তাঁর ও আমার মধ্যে আর কোন নবী নেই" (কানজুল উম্মাল, ১৭ খণ্ড, হাদিস ১০৩৩)। অন্যত্র বলেছেন, "দুনিয়ায় এবং আখেরাতে আমি ঈসা ইবনে মারিয়ামের (আ.) সবচেয়ে নিকটতম। সকল নবীরাই ভাই ভাই, কেবল তাদের মা আলাদা। তাদের সবাই একই ধর্মের অনুসারী। (হাদীস- আবু হোরায়রা রা. থেকে বোখারী)।

আবার ঈসা (আ.) শেষ নবী সম্পর্কে তাঁর আসহাবদেরকে বলেছেন, "বিশ্বাস করো আমি তাঁকে দেখেছি এবং তাঁকে সম্মান জানিয়েছি। এভাবে সকল

নবী তাঁকে দেখেছেন। তাঁর রূহকে দর্শনের মাধ্যমে নবীগণ নব্যুয়তপ্রাপ্ত হয়েছেন। আমি যখন তাঁকে দেখলাম আত্মা প্রশান্ত হয়ে গেল। আমি বললাম, O Muhammad;, God be with you, and may he make me worthy to untie your shoelatchet; for obtaining this I shall be a great prophet and holy one of God. হে মোহাম্মদ! আল্লাহ আপনার সহায় হোন। আমাকে তিনি আপনার জুতার ফিতা বাঁধার যোগ্যতা দান করুন। কারণ আমি যদি এই মর্যাদা লাভ করি তাহলে আমি একজন বড় নবী হবো এবং আল্লাহর একজন পবিত্র মানুষ হয়ে যাবো। (The Gospel of Barnabas, Chapter 44)".

এই ছিল একজন নবীর নিকটে অপর একজন নবীর সম্মান, মর্যাদা। অথচ তাদেরই অনুসারী দাবি করে আমরা বংশ পরম্পরায় শত্রুতা করে যাচ্ছি, মসজিদ গুড়িয়ে দিচ্ছি, উপাসনালয় ভাঙছি, মূর্তি ভাঙছি, দাঙ্গা করছি, রক্তপাত করছি। খ্রিষ্টানদের সম্পর্কে কোর'আনে বলা আছে- তুমি অবশ্যই মুমিনদের জন্য বন্ধুত্বে তাদেরকে নিকটে পাবে যারা বলে, 'আমরা নাসারা (খ্রিষ্টান)'। এর কারণ এই যে, খ্রিষ্টানদের মধ্যে আলেম রয়েছে, দরবেশ রয়েছে এবং তারা অহংকার করে না। (মায়েদা, ৮২)।

নাজ্জাশী ছিলেন খ্রিষ্টান শাসক। তিনি রসুলাল্লাহকে সত্য প্রচারে সহযোগিতা করলেও ইসলাম গ্রহণ করেছেন বলে কোনো ইতিহাসে পাওয়া যায় না। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ না করলেও রসুলাল্লাহ তাঁকে মুসলিমদের ভাই হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

নাজ্জাশী ইন্তেকাল করেছিলেন তাবুক যুদ্ধের পর নবম হিজরীতে। আল্লাহর রসুল (স.) নাজ্জাশীর ইন্তেকালের তারিখেই তার মৃত্যু সংবাদ সাহাবাদের জানান এবং জামায়াতবদ্ধ হয়ে গায়েবানা জানাযার ব্যবস্থা করেন। তিনি সাহাবাদেরকে বলেন- 'তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জানাযা পড় যিনি তোমাদের দেশ ব্যতীত অন্য দেশে মৃত্যুবরণ করেছেন।' রসুলাল্লাহ যখন জানাযায় দাঁড়ালেন তখন কয়েকজন মোনাফেক মন্তব্য করে যে, রসুলাল্লাহ একজন কাফেরের জানাযা পড়াচ্ছেন। এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ সুরা আল ইমরানের ১৯৯ নং আয়াত নাজেল করলেন যেখানে বলা হয়েছে- 'আহলে কিতাবদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও রয়েছে, যারা আল্লাহর উপর ঈমান আনে এবং যা কিছু তোমার উপর অবতীর্ণ হয় আর যা কিছু তাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলোর উপর, আল্লাহর সামনে বিনয়াবনত থাকে এবং আল্লাহর আয়াতসমূহকে স্বল্পমূল্যের বিনিময়ে সওদা করে না, তারাই হলো সে লোক যাদের জন্য পারিশ্রমিক রয়েছে তাদের পালনকর্তার নিকট। নিশ্চয়ই আল্লাহ যথাশীঘ্র হিসাব চুকিয়ে দেন।'

নাজ্জাশী যে মুসলিম ছিলেন না, আহলে কিতাব অর্থাৎ খ্রিষ্টান ছিলেন এবং আহলে কিতাবরাও সত্য প্রতিষ্ঠার কাজে সাহায্য করে আল্লাহর নিকট প্রতিদান লাভ করতে পারে তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ এই আয়াতটিই। আজ মুসলিমরা মনে করেন যে কেবল তারাই আল্লাহর প্রিয়, তারাই জান্নাতে যাবে বিষয়টি কিন্তু তা নয়। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে নাজ্জাশী ধর্মব্যবসায়ী ছিলেন না, ধর্মকে তিনি স্বার্থ হাসিলের মাধ্যমে পরিণত করেন নি।

এই ঘটনার দ্বারা আল্লাহর শেষ রসুল তাঁর জাতির জন্য দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন যে, তোমরা একে অপরের শত্রু নও, আলাদা নও, তোমরা যাঁদের অনুসারী তাঁরা একই স্রষ্টার পক্ষ থেকে প্রেরিত, সুতরাং অনুসারীদের মধ্যে বিভক্তির প্রাচীর তুলে রাখার কোনো বৈধতা নেই, যুক্তিও নেই। এই ছিল মুসলিমদের সাথে খ্রিষ্টানদের সম্পর্ক। প্রশ্ন হতে পারে, তাই যদি হবে তাহলে পরবর্তীতে তিনি খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন কেন?

পরবর্তীতে খ্রিষ্টানদের সাথে মুসলিমদের যে যুদ্ধের ইতিহাস পাওয়া যায় তার পেছনে বহু কারণ নিহিত রয়েছে। প্রধান কারণ ছিল রাজনৈতিক। রসুলাল্লাহ (স.) যখন মদীনার রাষ্ট্রপ্রধান, তখন মক্কাবাসী মোশরেকরা পৃথিবী থেকে সত্যদীনকে মুছে ফেলার অভিপ্রায় নিয়ে অনেকবার তাঁকে আক্রমণ করেছে। সে আক্রমণে যারা যারা সাহায্য করেছে তাদের বিরুদ্ধে তিনি পরবর্তীতে অভিযান পরিচালনা করেছেন। সেটা ছিল রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। সেটা কোনো আন্তঃধর্মীয় যুদ্ধ ছিল না। পবিত্র জেরুসালেম

শেষ নবীর পূর্ববর্তী নবী-রসুলগণ কোনো নির্দিষ্ট জনপদে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর প্রতি প্রেরিত হলেও তাঁরা সমগ্র পৃথিবীর সম্পদ, সমগ্র মানবজাতির সম্পদ। এজন্য তাঁদের অনেকের ইতিহাস শেষ গ্রন্থে তাঁরা যে বিধান এনেছেন স্থান-কাল-পাত্রভেদে সেগুলোতে শরিয়াহর কিছু রদ-বদল থাকলেও মূল শিক্ষায় কোনো পার্থক্য ছিল না। কারণ, পৃথিবীর সত্য, শাশ্বত, সনাতন নিয়ম-নীতির কোনো পরিবর্তন হয় না। এই শাশ্বত শিক্ষা যেমন আল কোর'আনে আছে, তেমন বাইবেলেও আছে। কাজেই মুসলিমরা কোর'আনের পাশাপাশি বাইবেল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবেন, ইঞ্জিলের বহু কথা আল্লাহ কোর'আনেও উল্লেখ করেছেন। তেমনি খ্রিষ্টানরাও বাইবেলের পাশাপাশি কোর'আন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবেন এমনটাই হওয়া উচিত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, মুসলিম ও খ্রিষ্টানদের মধ্যে কার্যত হিংসা, বিদ্বেষ, যুদ্ধ, হানাহানি তথা শত্রুতার যুক্তিসঙ্গত ধর্মীয় কোনো কারণ নেই।

শহর মুসলিম বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করার পর খলিফা ওমর বিন খাত্তাব (রা.) ঘুরে ঘুরে শহরের দর্শনীয় বস্তুগুলি দেখার সময় যখন খ্রিষ্টানদের একটি অতি প্রসিদ্ধ গির্জা দেখছিলেন তখনি সালাতের সময় হওয়ায় তিনি গির্জার বাইরে যেতে চাইলেন। জেরুজালেম তখন সবেমাত্র মুসলিমদের অধিকারে এসেছে, তখনও কোনো মসজিদ তৈরিই হয় নি, কাজেই সালাহ খোলা ময়দানেই কায়েম করা হতো। জেরুজালেমের প্রধান ধর্মাধ্যক্ষ বিশপ সোফ্রোনিয়াস ওমরকে (রা.) অনুরোধ করলেন ঐ গির্জার মধ্যেই তার সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে নামাজ পড়তে। ভদ্রভাবে ঐ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে ওমর (রা.) গির্জার বাইরে যেয়ে সালাহ কায়েম করলেন। কারণ কি বললেন তা লক্ষ্য করুন। বললেন- আমি যদি ঐ গির্জার মধ্যে নামাজ পড়তাম তবে ভবিষ্যতে মুসলিমরা সম্ভবতঃ একে মসজিদে পরিণত করে ফেলত। একদিকে ইসলামকে পৃথিবীময় প্রতিষ্ঠিত করতে সর্বস্ব পণ করে দেশ থেকে বেরিয়ে সুদূর জেরুজালেমে যেয়ে সেখানে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা, অন্যদিকে খ্রিষ্টানদের গির্জা যেন কোনো অজুহাতে মুসলিমরা মসজিদে পরিণত না করে সে জন্য অমন সাবধানতা। উম্মতে মোহাম্মদী যত যুদ্ধ করেছিল সেগুলির উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর বিধান জাতীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করা (আজ যেমন জাতীয়ভাবে ব্রিটিশের আইন-বিধান মেনে নেওয়া হয়েছে)। কিন্তু তারা ব্যক্তিগতভাবে একটি মানুষকেও তার ধর্ম ত্যাগ করে এই দীন গ্রহণে বাধ্য করেন নি। শুধু তাই নয়, যেখানেই তারা আল্লাহর হুকুম, বিধান প্রতিষ্ঠা করেছেন সেখানেই অন্য ধর্মের চার্চ, সিনাগগ, মন্দির ও প্যাগোডা রক্ষার দায়িত্ব তো নিয়েছেনই তার উপর ঐ সব ধর্মের লোকজনের যার যার ধর্ম পালনে কেউ যেন কোনো অসুবিধা পর্যন্ত না করতে পারে সে দায়িত্বও তারা নিয়েছেন। একটি উদাহরণ দিই। আমর ইবনুল আস (রা.) এর মিসর বিজয়ের পর আলেকজান্দ্রিয়ায় কে একজন একদিন রাত্রে যিশু খ্রিস্টের প্রস্তর নির্মিত প্রতিমূর্তির নাক ভেঙ্গে ফেললো। এতে খ্রিষ্টানরা উত্তেজিত হয়ে উঠলো। তারা ধরে নিল যে, এটা একজন মুসলিমেরই কাজ। আমর (রা.) সব শুনে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তিনি প্রতিমূর্তিটি সম্পূর্ণ নতুন করে তৈরি করে দিতে চাইলেন। কিন্তু খ্রিষ্টান নেতাদের প্রতিশোধ নেবার বাসনা ছিল অন্যরূপ। তারা বলল, "আমরা চাই আপনাদের নবী মোহাম্মদের (সা.) প্রতিমূর্তি তৈরি করে ঠিক অমনিভাবে তাঁর নাক ভেঙ্গে দেব।"

এ কথা শুনে বারুদের মতো জ্বলে উঠলেন আমর (রা.)। প্রাণপ্রিয় নবীজির প্রতি এত বড় ধৃষ্টতা ও বেয়াদবি দেখে তাঁর ডান হাত তলোয়ার বাটের উপর মুষ্টিবদ্ধ হয়। ভীষণ ক্রোধে তাঁর মুখমণ্ডল উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ নীরব থেকে নিজেকে সংবরণ করে নিয়ে বললেন, "আমার অনুরোধ, এ প্রস্তাব ছাড়া অন্য যে কোনো প্রস্তাব করুন আমি তাতে রাজি আছি।" পরদিন খ্রিষ্টানরা ও মুসলিমরা বিরাট এক ময়দানে জমায়েত হলো। আমর (রা.) সবার সামনে হাজির হয়ে বিশপকে বললেন, "এদেশ শাসনের দায়িত্ব আমার। যে অপমান আজ আপনাদের ধর্মের হয়েছে, তাতে আমার শাসন দুর্বলতাই প্রকাশ পেয়েছে। তাই তরবারি গ্রহণ করুন এবং আপনিই আমার নাক কেটে দিন।" এই কথা বলেই তিনি বিশপকে একখানি তীক্ষ্ণধার তরবারি হাতে দিলেন। জনতা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, খ্রিষ্টানরা স্তম্ভিত। চারদিকে থমথমে ভাব। সহসা সেই নীরবতা ভঙ্গ করে একজন মুসলিম সৈন্য এলো। চিৎকার করে বললো, "থামুন! আমি ঐ মূর্তির নাক ভেঙ্গেছি। অতএব আমার নাক কাটুন।" বিজিতদের উপরে বিজয়ীদের এই উদারতায় ও ন্যায়বিচারে মুগ্ধ হয়ে সেদিন শত শত খ্রিষ্টান ইসলাম কবুল করেছিলেন। সুতরাং উম্মতে মোহাম্মদীর যুদ্ধগুলো ছিল রাজতান্ত্রিক স্বৈরশাসকদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, কোনো সম্প্রদায় বিশেষের বিরুদ্ধে নয়। খ্রিষ্টান শাসকরা যুদ্ধগুলোর মধ্যে ধর্মীয় চেতনাকে ব্যবহার করেছেন, যেমন বর্তমানে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য ধর্মকে ব্যবহার করা হচ্ছে। মুসা (আ.) যুদ্ধ করেছেন ফেরাউনের বিরুদ্ধে, শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ করেছেন আপন মামা কংসের বিরুদ্ধে, যুধিষ্ঠির যুদ্ধ করেছেন আপন চাচার বিরুদ্ধে, চাচাতো ভাইদের বিরুদ্ধে, আখেরী নবীও যুদ্ধ করেছেন আপন চাচার বিরুদ্ধে, গোত্রের বিরুদ্ধে। অর্থাৎ বহু নবীকেই যুদ্ধ করতে হয়েছে। কারণ একটাই- অসত্যের বিরুদ্ধে প্রথমে ঘৃণা, তারপর প্রতিবাদ, শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে হয়েছে। এটাই সনাতন রীতি। রসুলাল্লাহ (স.) ও তাঁর প্রকৃত অনুসারীরা মাত্র ৬০/৭০ বছরের মধ্যে অর্ধপৃথিবী অধিকার করেছিলেন। বস্তুত অন্যায়-অবিচার, অশান্তি নির্মূল করে শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা করাই ছিল এর উদ্দেশ্য, কোনো জাতি বা ধর্মকে আঘাত করা নয়।

এতে বর্তমানে প্রতিটি ধর্মের অনুসারীরা মনে করেন স্রষ্টা কেবল আমাদের সাথেই আছেন। আমরা স্রষ্টার প্রিয় জাতি, অন্যরা অবাধ্য, তারা নরকে যাবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো বর্তমানে আমরা যে পরিস্থিতিতে আছি তাতে স্রষ্টা আমাদের কারও প্রতিই খুশি নন। মানুষে মানুষে বিভেদের অভেদ্য প্রাচীর তৈরি করে এবং মানবতাকে উপেক্ষা করে নিত্য অশান্তির সৃষ্টি করে আমরা নিজেদের হাতেই আল্লাহর অভিশাপ ক্রয় করে নিয়েছি। এখন প্রতিনিয়ত তার ফল ভোগ করছি। এখন এ অভিশাপ থেকে বাঁচার একমাত্র রাস্তা হলো আবার সকল মানুষের জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে ভাই ভাই হয়ে যাওয়া। সকল প্রকার অনৈক্যকে পেছনে ফেলে নবী-রসুল-অবতারদের প্রকৃত ও মৌলিক শিক্ষা মোতাবেক ঐক্যবদ্ধ হওয়া। আসুন আমরা নিজ নিজ ধর্মের সত্য ও শাশ্বত বিধানের আশ্রয় গ্রহণ করে স্রষ্টাহীন, বস্তুবাদী 'সভ্যতা' দাজ্জালের সৃষ্ট অশান্তির অনল থেকে নিজেদের মুক্ত করি।

লেখক: সাহিত্য সম্পাদক, দৈনিক বজ্রশক্তি

বিকৃত ইসলাম ও প্রকৃত ইসলামের মধ্যে সীমারেখা টানতে হবে

-মসীহ উর রহমান

আমরা হেযবুত তওহীদ বিগত একুশ বছর ধরে যে কথাটি জোর দিয়ে বলার চেষ্টা করেছি তা হচ্ছে- বর্তমানে ইসলামের নাম করে যে দীন বা ধর্মটি চালু রয়েছে সেটা আল্লাহ-রসুলের প্রকৃত ইসলাম নয়, এটা বিকৃত ইসলাম। বর্তমানের উদ্ভূত পরিস্থিতিতে অনেকেই এ সত্যটি স্বীকার করছেন। অথচ এই সত্য কথাটি বলার কারণে এতদিন আমাদেরকে কী পরিমাণ দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে তা বলাই বাহুল্য।

যে ইসলাম মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে গুটিকতক স্বার্থবাজের হাতে বন্দী করে রাখে, যে ইসলাম রাজনীতির হাতিয়ার হয়ে সমাজ ও দেশকে অস্থিতিশীল করে তোলে, যে ইসলাম নৃশংসভাবে নিরীহ মানুষ খুন করাকে বৈধতা দান করে সে ইসলামের ব্যাপারে পরিষ্কারভাবে বলতে হবে- ওই ইসলাম ইসলামই নয়।

ধর্মের নাম করে মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ড চলছে সর্বত্র। কোথাও ধর্মবিশ্বাসকে ব্যবহার করে আর্থিক স্বার্থ হাসিল করা হচ্ছে, কোথাও অপরাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, কোথাও আবার জঙ্গিবাদ সৃষ্টি করা হচ্ছে। এই সবই চলছে ইসলামের নামে। এসব দেখে-শুনে অনেককেই বলতে শুনি- এটা ইসলামের কাজ নয়, ওটা ইসলামের কাজ নয়, এটা হারাম, ওটা ইসলামবিরোধী ইত্যাদি। আমাদের কথা হচ্ছে- এভাবে ভাসাভাসা করে কথা বললে এ সমস্যার সমাধান আসবে না। যে ইসলাম মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে গুটিকতক স্বার্থবাজের হাতে বন্দী করে রাখে, যে ইসলাম রাজনীতির হাতিয়ার হয়ে সমাজ ও দেশকে অস্থিতিশীল করে তোলে, যে ইসলাম নৃশংসভাবে নিরীহ মানুষ খুন করাকে বৈধতা দান করে সে ইসলামের ব্যাপারে পরিষ্কারভাবে বলতে হবে- ওই ইসলাম ইসলামই নয়।

বিকৃত ইসলামের শতরূপ থাকতে পারে, কিন্তু প্রকৃত ইসলাম হবে একটাই, যেটা আল্লাহ তাঁর রসুলের মাধ্যমে পাঠিয়েছিলেন। সেই প্রকৃত ইসলাম আর বর্তমানের বিকৃত ইসলামের মধ্যে স্পষ্ট সীমারেখা যতদিন টানা না হচ্ছে, ততদিন ধর্মকেন্দ্রিক এই সঙ্কট থেকে মুক্তির আশা করা বৃথা।

প্রচলিত বিকৃত ইসলাম দ্বারা জঙ্গিবাদকে ভুল প্রমাণ করা সম্ভব নয়। কেননা জঙ্গিরা এই ইসলাম থেকেই তাদের কাজের বৈধতা হাজির করছে। এই ইসলামকে সঠিক বলে ধরে নিলে জঙ্গিবাদকেও সঠিক ধরে নিতে হবে। একইসাথে মুরতাদ হত্যা তথা চাপাতিবাজিকেও সঠিক ধরতে হবে। জঙ্গিরা ফিকাহর বই ঘেঁটে রেফারেন্স হাজির করে যে, মুরতাদদেরকে হত্যা করা জায়েজ। ধর্মানুভূতির হুজুগ তুলে দেশকে অস্থিতিশীল করে তোলাকেও সঠিক ধরতে হবে। কারণ ইসলামের যে বিকৃত রূপ আমরা দেখছি তা দিয়ে বৈধকে অবৈধ বানানো কিংবা অবৈধকে বৈধ বানানো কোনো ব্যাপারই না। এটা সম্ভব হয় কারণ বর্তমানে ইসলাম বলে যেটাকে পালন করা হচ্ছে তা আল্লাহ-রসুলের প্রতি আনুগত্য শেখায় না, এ ইসলাম আনুগত্য করতে শেখায় ধর্মীয় নেতাদের প্রতি। আল্লাহ কী বলেছেন, রসুল কী বলেছেন সেটা এই ইসলামে দেখার বিষয় নয়, কথিত আলেম-মাশায়েখরা কী বলেছেন সেটাই হলো আসল বিষয়। কে প্রকৃত আলেম আর কে ধর্মব্যবসায়ী আলেম তার পার্থক্যও এখানে বিবেচ্য নয়।

সুতরাং গোড়ায় নজর দিতে হবে। বিষবৃক্ষের শাখা-প্রশাখা, ডাল-পালা ধরে ধরে অমুক হারাম, তমুক হারাম ফতোয়া দিয়ে লাভ হবে না। ওই গাছটাই যে হারাম সেটা বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করতে হবে। মানুষকে শিক্ষা দিতে হবে আল্লাহ-রসুলের প্রকৃত ইসলাম। সেই প্রকৃত ইসলাম নিয়েই মাঠে আছে হেযবুত তওহীদ।

লেখক: আমীর, হেযবুত তওহীদ

বাংলার সুফি সাধকরা কেমন ছিলেন?

মো. আসাদ আলী

বাংলায় ইসলামের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায়, প্রথমে মুসলিমরা এতদঞ্চলের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হয়, তারপর সুফি-দরবেশদের আগমন ঘটে। সুফি-সাধকদের আধ্যাত্মিক ক্ষমতা ও কেরামতি দেখে বহু মানুষ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। ইতিহাসবিদদের মধ্যে সুফিবাদকে অতি মূল্যায়ন করতে গিয়ে এখানকার মুসলিম শাসনের গুরুত্বকে ছোট করে দেখানোর একটি প্রবণতা লক্ষ করা যায় এবং তার প্রভাবে অনেকে মনে করেন- এখানকার মানুষের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের সবটুকু কৃতিত্বই সুফিদের প্রাপ্য। কিন্তু এ ধারণা সর্বাংশে সত্য নয়। প্রকৃতপক্ষে অত্র এলাকায় ইসলামের বীজ বপন করে মুসলিম শাসকরা, আর সেই বীজকে চারায় রূপান্তরিত হবার জন্য উপযুক্ত আলো-বাতাস সরবরাহ করেন সুফি-সাধকরা। বাংলায় ইসলামের প্রচার ও প্রসারে মুসলিম মুজাহিদরা সর্বাত্মক সংগ্রাম করার মাধ্যমে যে অবদান রেখেছেন, সুফি-দরবেশদের অবদানের চেয়ে তা কোনো অংশে কম নয়। কিন্তু মুজাহিদদের সেই সংগ্রামকে ছাপিয়ে সুফি-দরবেশদের অবদানকে বড় ও প্রধান করে দেখানোর অন্যতম কারণ হচ্ছে ইসলামের সংগ্রামী দিকটিকে আড়াল করে রাখা এবং প্রমাণের চেষ্টা করা যে, ইসলাম হচ্ছে নামাজ, রোজা, যেকের-আজগার, দোয়া-কালাম, আধ্যাত্মিক সাধনা ইত্যাদি ব্যক্তিগত উপসনাকেন্দ্রিক ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রের সাথে ইসলামের সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ মুসলিমদের উচিত কেবল ব্যক্তিগত ইবাদত-আমল নিয়ে পড়ে থাকা, সমাজের কোথাও অশান্তি আছে কিনা, অন্যায়-অবিচার হচ্ছে কিনা, কেউ অধিকারবঞ্চিত হচ্ছে কিনা- এসব নিয়ে মাথা ঘামানো মুসলিমদের দায়িত্ব নয় বা তা ধর্মের বিষয় নয়। এ প্রবণতা প্রথম শুরু হয় ব্রিটিশ শাসনামলে মুসলিমদেরকে পদানত করে রাখার জন্য। তারপর তা সংক্রমিত হয় উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে। এ বিষয়ে বিস্তারিত লিখতে গেলে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লেখা যায়। আমার আলোচনার প্রসঙ্গ সেটা নয়। মূল আলোচনায় যাবার আগে এটুকু জেনে রাখলেই চলবে যে, বাংলায় ব্যাপকভাবে ইসলামের আগমন ঘটেছিল মুসলিম মুজাহিদদের সংগ্রামের ফলে এবং ইসলামের প্রসার ঘটেছিল মুসলিম শাসক ও ওলি-আউলিয়াদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়।

ওলি-আউলিয়াদের সম্পর্কে অনেকেরই ধারণা সীমিত, যাদের ধারণা আছে তারা আবার মিথ্যা ইতিহাসের শিকার হয়ে থাকেন। ওলি-আউলিয়ার নাম শুনলেই আমাদের চোখের সামনে যেমন ধ্যানগ্রস্ত বুজুর্গের ছবি ভেসে ওঠে বাস্তবতা কিন্তু তেমন নয়। তাদের জীবনেও রয়েছে সংগ্রামী সোনালী অধ্যায়। দুই জালাল, শেখ জালালুদ্দিন তাবরিজী (মৃত্যু ১২২৬ অথবা ১২৪৪) ও শেখ শাহজালাল (মৃত্যু ১৩৪৭) ছিলেন বাংলার শ্রেষ্ঠ দুই সুফি সাধক। ১২০৫ সালে হিন্দু রাজা লক্ষণসেনকে পরাজিত করে বখতিয়ার খিলজীর বাংলা বিজয়ের পর শেখ জালালুদ্দিন তাবরিজী বাংলায় আসেন। তিনি পান্দুয়ার (মালদহ, পশ্চিম বাংলা) নিকট দেবতলায় স্থায়িভাবে বসতি গাড়েন। তার সমকালীন ঘটনাপ্রবাহ তেমন জানা না গেলেও ঐতিহাসিকরা কতিপয় ঘটনার সূত্র ধরে ধারণা করেন, তার সাথে প্রত্যক্ষ যুদ্ধ বা যুদ্ধসংশ্লিষ্ট সহিংসতার ঘটনা ঘটে এবং হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী একটি বড় সংখ্যার জনগোষ্ঠী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। বাংলার আরেক শ্রেষ্ঠ সুফি সাধক আবাস গেড়েছিলেন সিলেটে। বাংলাদেশি মুসলিমদের কাছে তিনি আজও

ওলি-আউলিয়াদের সম্পর্কে অনেকেরই ধারণা সীমিত, যাদের ধারণা আছে তারা আবার মিথ্যা ইতিহাসের শিকার হয়ে থাকেন। ওলি-আউলিয়ার নাম শুনলেই আমাদের চোখের সামনে যেমন ধ্যানগ্রস্ত বুজুর্গের ছবি ভেসে ওঠে বাস্তবতা কিন্তু তেমন নয়।

অতুলনীয় সম্মানের অধিকারী হয়ে আছেন। বাংলাদেশের সিলেটে শাহজালাল (র.)- এর স্থায়িভাবে বসবাস শুরু করার ঠিক পূর্বে সিলেটের শাসনকর্তা ছিলেন গৌড়গোবিন্দ নামে এক হিন্দু রাজা। শাহজালাল বাংলায় আসার পূর্বে গৌড়ের সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ দুইবার গৌড়গোবিন্দকে আক্রমণ করেন। উভয় আক্রমণের নেতৃত্বে ছিলেন সুলতান শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহের ভাতিজা সিকান্দর খান গাজী। দুবারেই মুসলিমরা পরাজিত হয়। এরপর সুলতানের প্রধান সেনাপতি নাসিরুদ্দিনের পরিচালনায় গৌড়গোবিন্দের বিরুদ্ধে তৃতীয় আক্রমণ চালানো হয়। এ অভিযানে অংশ নিতে বিখ্যাত সুফি সাধক নিজামুদ্দিন আউলিয়া তার বিশিষ্ট শিষ্য শাহজালালকে ৩৬০ জন অনুসারীসহ প্রেরণ করেন। শাহজালাল (র.) ভক্তদের নিয়ে বাংলায় পৌছে মুসলিম বাহিনীতে যোগ দেন। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর রাজা গৌড়গোবিন্দ পরাজিত হয়। কথিত আছে সেই যুদ্ধে মুসলিমদের বিজয়ের সবটুকু কৃতিত্বই ছিল শাহজালাল (র.) ও তার ভক্তদের প্রাপ্য। সিলেটে শাহজালাল (র.) এর মাজারে এই সুফি সাধক ও বীর মুজাহিদের তলোয়ার এখনও সংরক্ষিত আছে।

অপর এক দৃষ্টান্ত অনুসারে, বাংলায় ইসলামের প্রসারে সুফি সাধক নূর কুতুব-ই-আলম কেন্দ্রীয় ভূমিকা রেখেছিলেন বলে জানা যায়। ১৪১৪ সালে বিদ্রোহী হিন্দু যুবরাজ গণেশ মুসলিম শাসককে হটিয়ে দিয়ে বাংলার ক্ষমতা দখল করেন। এ বিদ্রোহের ফলে বাংলার সুফিরা প্রচণ্ড অসন্তুষ্ট হন এবং তারা তার শাসন মেনে নিতে অস্বীকার করে বাংলার বাইরের মুসলিম শাসকদের কাছে সাহায্যের আবেদন করেন। তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইব্রাহিম শাহ সারকি বাংলা আক্রমণ করে গণেশকে পরাজিত করেন। তৎকালীন বাংলার নেতৃস্থানীয় সুফি সাধক নূর কুতুব-ই-আলম সাময়িক শান্তি স্থাপনের মধ্যস্থতাকারী রূপে এগিয়ে আসেন। তিনি গণেশকে সিংহাসন ত্যাগে বাধ্য করে গণেশের বার বছরের মুসলিম পুত্র জালালুদ্দিন মোহাম্মদকে সিংহাসনে বসান।

একইভাবে ইসলামের সত্য ও ন্যায়ের আলো সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়ার অভিপ্রায়ে দক্ষিণ বাংলায় সংগ্রাম করেন খান জাহান আলী (র.), টাঙ্গাইলে বাবা আদম কাশ্মীরি, উত্তর বাংলায় সুলতান মাহমুদ মাহী সওয়ার (র.), পশ্চিম বাংলায় শাহ শফী উদ্দিন (র.), শাহ সুলায়মান (র.), সৈয়দ চন্দন শহীদসহ অনেক বিপ্লবী মুজাহিদ। তাদের জীবনী পড়লে দেখা যায় যে, সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রামেই তাদের জীবনের বেশির ভাগ সময় কেটেছে। সিলেটের শাহজালালের (র.) মতো অনেকের হাতের তলোয়ার আজও রক্ষিত আছে। তারা যে আধ্যাত্মিক সাধকও ছিলেন না তা আমি বলছি না, তাদের আধ্যাত্মিক সাধনাও অবশ্যই ছিল। কারণ তাদের জীবন প্রকৃত মুসলিম ও উম্মতে মোহাম্মদীর মতোই ভারসাম্যযুক্ত ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তাদের জীবনের সংগ্রামের ভাগটুকু ছেটে ফেলে তাদের কেরামতির ভাগটাকেই শুধু প্রধান নয় একমাত্র ভাগ বলে প্রচার করা হয়েছে।

ইসলামকে সুফি-সাধকের ধর্ম ও বাংলাদেশকে সুফি-সাধকদের দেশ বলে ইসলামকে মসজিদ-মাদ্রাসা-খানকা-দরগার চৌহদ্দির ভেতরে আটকে রাখার যে প্রচেষ্টা চলে ইতিহাস তাকে সমর্থন করে না। সুফি সাধকরা যেটা করেছেন সে বিবেচনা থেকে বলতে গেলে বলতে হবে- ইসলাম মিথ্যার বিরুদ্ধে লড়াই করার ধর্ম, সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের ধর্ম, অন্যায়ের সঙ্গে সংঘর্ষের ধর্ম। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংঘর্ষকে এড়িয়ে চলার বাসনায় মিথ্যাকে মেনে নেওয়ার নাম ইসলাম নয়। এমনকি ব্যক্তিগতভাবে আধ্যাত্মিক চর্চা করে কেরামতির ক্ষমতা অর্জন করাও ইসলামের চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়। ইসলামের উদ্দেশ্য মানবজীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যার জন্য সংঘর্ষ ও লড়াইয়ের প্রয়োজন। বাংলার সুফি-সাধকরা একদা সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করেছেন বলেই এতদঞ্চলের মানুষ ইসলামের দেখা পেয়েছে। তারা যদি ঘরে বসে থেকে কেবল ভারসাম্যহীনভাবে ধ্যান করেই জীবন পার করতেন তাহলে আমাদের ইতিহাস অন্য রকম হতো। সুতরাং কেউ যদি বলে 'শাহ জালালের বাংলাদেশ' কেউ যদি বলে 'সুফি সাধকের বাংলাদেশ' তা এই অর্থই প্রকাশ করে যে, বাংলাদেশ মিথ্যা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের দেশ, বাংলাদেশ সংগ্রামের দেশ, বাংলাদেশ প্রতিবাদের দেশ। অন্যায়, অবিচার, অশান্তি দেখে মুখ বুঁজে ও হাত গুটিয়ে বসে থাকার দেশ বাংলাদেশ নয়, কারো অধীনতা স্বীকার করার দেশ নয়। সুফি-সাধকরা অন্যায়-অশান্তি দেখেও হাত গুটিয়ে বসে থাকার শিক্ষা দেন নি।

আরেকটা বিষয় স্পষ্টত মনে রাখতে হবে, এই সমস্ত সুফি-সাধক তথা মোজাহেদগণ অন্যায়ের বিরুদ্ধে যোদ্ধা ছিলেন, দাঙ্গা সৃষ্টিকারী, ফেৎনাবাজ, ফতোয়াবাজ ছিলেন না। তারা অন্যায়ভাবে নির্দেশ, নিরীহ সাধারণ মানুষকে ধর্মের দোহাই দিয়ে হামলা চালিয়ে ব্যক্তিস্বার্থ বা রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল করেননি, বরং সর্বস্ব কোরবান করে শেষে নিজেদের জীবন পর্যন্ত দিয়ে অত্র অঞ্চলের মানুষের মুক্তি এনে দিয়েছেন। তাদের শিক্ষাকে ভুলিয়ে দিয়ে এখন তাদের নাম ব্যবহার করে নানা পন্থায় স্বার্থোদ্ধার চলছে।

লেখক: সহকারী সাহিত্য সম্পাদক, দৈনিক বজ্রশক্তি

আকিদা-ঈমান-আমল

রাকীব আল হাসান

লক্ষ-কোটি টাকা খরচ করে আলিশান মসজিদ নির্মিত হচ্ছে। টাইলসের মসজিদ, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মসজিদ, সোনার গম্বুজ ওয়ালা মসজিদ, এমন বিভিন্ন রকম মসজিদ তৈরি হচ্ছে যেন সবাই শান্তিতে নামাজ পড়তে পারে। সহি-শুদ্ধভাবে কোর'আন শিক্ষা হচ্ছে, নামাজের নিয়ম-কানুন শিক্ষা হচ্ছে, মানুষ মাদ্রাসা-মক্তবে যাচ্ছে যেন শুদ্ধভাবে নামাজ পড়তে পারা যায়। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে মানুষ হজ্বে যাচ্ছে, কোরবানি দিচ্ছে, যাকাত দিচ্ছে, রমজান মাসে রোজা রাখছে এমনকি অনেকে সারা বছর নফল রোজাও রাখছে, সারারাত জেগে নফল নামাজ পড়ছে অর্থাৎ আমল করে যাচ্ছে। আমল যেন নির্ভুল হয় সেজন্য আমরা সদা তৎপর কিন্তু সমস্ত আমলই অর্থহীন, ব্যর্থ হয়ে যাবে যেটা না থাকলে সেটার ব্যাপারে আমরা কতটা সচেতন?

যে কোনো আমলের পূর্বশর্ত হচ্ছে ঈমান। ঈমান ছাড়া আমল অর্থহীন। এখন এই ঈমান কী? ঈমান হলো- "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মদুর রসুলাল্লাহ (সা.), আল্লাহ ছাড়া কোনো হুকুমদাতা নেই এবং মোহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রসুল" এই কলেমাতে স্বীকৃতি দেওয়া। অর্থাৎ ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে জাতীয়, আন্তর্জাতিক এক কথায় জীবনের সর্ব অঙ্গনে আল্লাহর হুকুম তথা যাবতীয় ন্যায়কে মেনে নেওয়ার স্বীকৃতিই হচ্ছে ঈমান। সহজ কথায় যাবতীয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে ন্যায় স্থাপনার জন্য দৃঢ়প্রত্যয়ী হওয়া। স্বীকৃতির পরবর্তী কাজ হলো আল্লাহর রাস্তায় জীবন ও সম্পদ দিয়ে যাবতীয় অন্যায় দূর করে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। এটিই হলো সর্বপ্রথম এবং প্রধান আমল। এটি ছাড়া মো'মেন হওয়া যায় না। (সুরা হুজরাত-১৫)। যখন মানুষ তার জীবনে আল্লাহর আদেশ-নিষেধকে প্রত্যাখ্যান করেছে তখন সমাজ থেকে সকল প্রকার অন্যায় অবিচার দূর করে শান্তি প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম বাদ দিয়ে যত আমলই করা হোক তা নিরর্থক হবে।

কিন্তু আজ আমাদের এই আমল নিরর্থক হচ্ছে কি না ভাবতে হবে। আমরা আল্লাহ, নবী-রসুল, আসমানি কিতাব, আখেরাত, জান্নাত-জাহান্নাম, তকদীর ইত্যাদিতে বিশ্বাস করি কিন্তু ঈমান এই বিশ্বাসটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এই বিশ্বাসের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুম তথা ন্যায়, সত্য ধারণ করা এবং জীবন-সম্পদ দিয়ে সকল প্রকার অন্যায়-অসত্যের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করাই হচ্ছে প্রকৃত আমল। আজ আমরা নামাজ-রোজাসহ অনেক আমল করছি কিন্তু যে যার ক্ষেত্রে স্বার্থপর, ভোগবাদী পশ্চিমা বস্তুতান্ত্রিক আত্মাহীন দাজ্জালীয় সভ্যতার দর্শনে দীক্ষিত। ন্যায়ের বদলে অন্যায়কে ধারণ করেছি। আল্লাহর হুকুম তথা কলেমার মর্মবাণী প্রত্যাখ্যান করে কেবল মুখে কলেমার বাণী উচ্চারণ করে মো'মেন থাকা যায় না। মুখে মুসলিম দাবিদার হয়ে অন্যায়, অবিচার, প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা, স্বার্থপরতার জীবন দর্শন ধারণ করে সত্যিকার অর্থে মুসলিম থাকা যায় না।

কিন্তু আমরা একটা দৃশ্য সর্বত্র দেখতে পাই, শহর-গ্রাম, পাড়া-মহল্লাসহ সব জায়গাতেই মানুষ টুপি-পাঞ্জাবী পরে টাখনুর উপর পাজামা তুলে মসজিদে নামাজ পড়তে যাচ্ছে, কোরবানি করছে, হজ করে আসছে, ওয়াজ-মাহফিল শুনছে, কোর'আন তেলাওয়াত করছে, যিকির-আসগর করছে। অর্থাৎ আমরা বুঝাতে চাইছি আমরা পাক্কা মুসলমান। কিন্তু কিভাবে? এই যে আমল করে যাচ্ছি আমাদেরকে কে বলে দেবে সমাজে যখন চূড়ান্ত অন্যায় চলে, চরম অশান্তি চলে, মানুষগুলো ত্রাহী সুরে চিৎকার করে বাঁচার জন্য তখন তাদের জন্য ন্যায়পূর্ণ, শান্তিপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণের চেষ্টা না করে পাহাড় সমান আমল করলেও তা আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না।

কাজেই আগে আল্লাহর কলেমা, তওহীদ অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি দিয়ে (ন্যায় ও সত্যের পক্ষে দাঁড়িয়ে) মো'মেন হওয়া জরুরি। তারপরে যত পারা যায় ঐসব আমল।

আরেকটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো- ঈমানের পূর্বশর্ত হচ্ছে আকিদা। এ বিষয়ে সমস্ত আলেম ও ফকিহগণ একমত যে, আকিদা সঠিক না হলে ঈমানের কোনো মূল্য নেই। যে জিনিসটি সঠিক না হলে ঈমানের কোনো মূল্য নেই- সেই জিনিসটি অবশ্যই অতি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ নামাজ, রোজা, হজ, যাকাতসহ সকল ইবাদতের মূল হচ্ছে ঈমান। কিসের ওপর ঈমান? আল্লাহর, তাঁর রসুলদের, মালায়েকদের, হাশরের দিনের বিচারের, জান্নাত, জাহান্নাম, তকদীর ইত্যাদির ওপর ঈমান। এই ঈমান অর্থহীন হয়ে গেলে স্বভাবতঃই এই নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত এবং অন্যান্য সমস্ত রকমের ইবাদতও অর্থহীন। যে জিনিস সঠিক না হলে ঈমান এবং ঈমান ভিত্তিক সমস্ত আমল অর্থহীন সেই মহাগুরুত্বপূর্ণ আকিদা কী?

আকিদা হচ্ছে কোনো জিনিস বা ব্যাপার সম্বন্ধে সঠিক ও সম্যক ধারণা অর্থাৎ Comprehensive concept। কোনো জিনিস বা ব্যাপার, তা যে কোনো জিনিস হোক না কেন, সেটা দিয়ে কি হয়, সেটার উদ্দেশ্য কী সে সম্বন্ধে সামগ্রিক ধারণা হচ্ছে আকিদা। যে কোনো জিনিস বা ব্যাপার সম্বন্ধে এই ধারণা পূর্ণ ও সঠিক না হলে সেই জিনিসটি অর্থহীন। আল্লাহ তাঁর রসুলদের (আ.) মাধ্যমে মানবজাতিকে দীন অর্থাৎ জীবন-ব্যবস্থা দিয়েছেন। তিনি কি কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই এই দীন দিয়েছেন? অবশ্যই নয়। নিশ্চয়ই কোনো উদ্দেশ্য আছে। যদি আমরা সেই উদ্দেশ্য না বুঝি বা যদি সেই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভুল ধারণা করি, তবে ঐ দীন অর্থহীন হয়ে যাবে। এ জন্যই ফকিহরা, ইমামরা সকলেই একমত যে আকিদা অর্থাৎ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ধারণা সঠিক না হলে ঈমান ও সমস্ত আমল নিষ্ফল।

একটি উদাহরণ দিচ্ছি। কেউ আপনাকে একটি মোটর গাড়ি

উপহার দিলেন। মনে করুন এই মোটর গাড়িটি ইসলাম-আল্লাহ মানব জাতিকে যা উপহার দিয়েছেন। যিনি গাড়িটি উপহার দিলেন তিনি ঐ সঙ্গে গাড়িটির রক্ষণাবেক্ষণ কেমন করে করতে হবে সেই নিয়মাবলীর একটি বইও দিলেন, যাকে বলা হয় Maintenance Book। মনে করুন এই বই কোর'আন ও সহীহ হাদিস। গাড়ির উদ্দেশ্য কী? উদ্দেশ্য হচ্ছে ওটাতে চড়ে বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া। এটাই হচ্ছে গাড়িটির আসল উদ্দেশ্য। ওটাকে তৈরিই করা হয়েছে ঐ উদ্দেশ্যে। কিন্তু তার পাশাপাশি আরামে বসার জন্য তার ভেতরে গদীর আসন তৈরি করা হয়েছে, খবর, সঙ্গীত শোনার জন্য রেডিও, ডিভিডি প্লেয়ার লাগনো হয়েছে, গাড়িটিকে সুন্দর দেখাবার জন্য চকচকে রং করা হয়েছে। গাড়িটির সঙ্গে যে Maintenance বই আপনাকে দেয়া হয়েছে তাতে বলা আছে গাড়িটিতে কোন্ ধরনের পেট্রোল দিতে হবে, কত নম্বর মবিল দিতে হবে, কোথায় কোথায় চর্বি (Grease) দিতে হবে ইত্যাদি। শুধু তাই নয় দেখতেও যেন গাড়িটি সুন্দর হয় সেজন্য কোথাও রং খারাপ হয়ে গেলে কেমন রং কেমনভাবে লাগালে গাড়ি সুন্দর দেখাবে তাও সব কিছু আছে। ঐ Maintenance বইয়ে এত সব কিছু লেখা থাকলেও মূল সত্য হচ্ছে এই যে ঐ গাড়ি তৈরির উদ্দেশ্য হচ্ছে ওটা আপনাকে আপনার প্রয়োজনীয় গন্তব্যস্থানে নিয়ে যাবে। বাকি সব ঐ উদ্দেশ্যের পরিপূরক। এখন আপনি যদি না জানেন ঐ গাড়িটি দিয়ে কী হয়, ওটাকে কী উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে তবে আপনাকে ঐ গাড়িটি উপহার দেয়া নিষ্ফল, অর্থহীন। ঐ গাড়িটির উদ্দেশ্য আপনাকে প্রয়োজন মোতাবেক ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, রংপুর নিয়ে যাওয়া। আপনি যদি সেটাই না বোঝেন তবে আপনি কী করবেন? আরামের গদি দেখে ভাববেন এই গাড়িটিকে তৈরি করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই গদিতে বসে আরাম করা। কিংবা ভাববেন এটা তৈরির উদ্দেশ্য হচ্ছে রেডিও শোনা, সঙ্গীত শোনা। আর তাই মনে করে আপনি গাড়িটির আরামের সিটে বসে রেডিও, ডিভিডি বাজাবেন।

এই হলে আপনার আকিদার ভুল হলো। আপনাকে গাড়িটি উপহার দেয়া অর্থহীন হলো কারণ ওটার আসল উদ্দেশ্যই আপনি বুঝলেন না। আপনি যদি গাড়ির Maintenance বই দেখে দেখে অতি সতর্কতার সাথে যথাস্থানে চর্বি লাগান, মবিল দেন, চাকায় পাম্প দেন, গাড়ির ট্যাংকে তেল দেন, গাড়ির রং পালিশ করেন, তবুও সবই অর্থহীন যদি আপনি না জানেন যে গাড়িটির আসল উদ্দেশ্য কী? অর্থহীনতা ছাড়াও আরও একটি ব্যাপার হবে। সেটা হলো আপনার অগ্রাধিকারের (Priority) ধারণাও ভুল হয়ে যাবে। তখন আপনার কাছে গাড়ির ইঞ্জিনের চেয়েও প্রয়োজনীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে গাড়ির রেডিও, ডিভিডি প্লেয়ার, গাড়ির রং ইত্যাদি। অর্থাৎ অগ্রাধিকার ওলট-পালট হয়ে গিয়ে অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপার হয়ে যাবে অতি সামান্য বা একেবারে বাদ যাবে আর অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে মহা প্রয়োজনীয়। এ জন্যই সমস্ত আলেম, ফকিহ, ইমামরা একমত হয়েই বলেছেন যে, আকিদা অর্থাৎ কোনো ব্যাপার বা জিনিস সম্বন্ধে পূর্ণ ধারণা না হলে বা ওটার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভুল ধারণা হলে সম্পূর্ণ জিনিসটাই অর্থহীন- ঈমান এবং ঈমান ভিত্তিক অন্যান্য আমলও অর্থহীন।

আল্লাহ আমাদের ইসলাম বলে যে দীন, জীবন-বিধান দিয়েছেন সেটার উদ্দেশ্য কী, সেই আকিদা আমাদের বহু পূর্বেই বিকৃত হয়ে ঐ গাড়ির মালিকের মতো হয়ে গেছে- যে গাড়ির উদ্দেশ্যই জানে না। ঐ মালিকের মতো আমরা Maintenance বই, অর্থাৎ কোর'আন-হাদিস দেখে দেখে অতি সতর্কতার সাথে গাড়ির পরিচর্যা করছি- কিন্তু ওটাতে চড়ি না, ওটা চালিয়ে আমাদের প্রয়োজনীয় গন্তব্যস্থানে যাই না, গ্যারেজে রেখে দিয়েছি- কারণ ওটার আসল উদ্দেশ্যই আমরা জানি না বা যেটা মনে করি তা ভুল বা বিকৃত। কাজেই আমাদের অগ্রাধিকারও (Priority) ওলট-পালট হয়ে গেছে। প্রকৃত উদ্দেশ্যই অর্থাৎ তওহীদ ও তা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম আমরা ত্যাগ করেছি, কিন্তু গাড়ির রং, পালিশ, অর্থাৎ দাড়ি, টুপি, পাগড়ী, আলখাল্লা সম্বন্ধে আমরা অতি সতর্ক। আকিদার বিকৃতি ও তার ফলে অগ্রাধিকারের ওলট-পালটের পরিণাম এই হয়েছে যে, আল্লাহ আমাদের ত্যাগ করেছেন, আমরা তাঁর গযবের ও লানতের পাত্রে পরিণত হয়েছি।

আকিদার ভুলের কারণে ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জেহাদকে আজ সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যবহারের পরিবর্তে জঙ্গিবাদ সৃষ্টিতে ব্যবহার করা হচ্ছে। ইসলাম মানবজাতির যাবতীয় সমস্যা দূর করে ন্যায় ও শান্তিপূর্ণ একটা সমাজ উপহার দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু আকিদা ভুল হওয়ার কারণে আজ ইসলামকে কেবল সওয়াব কামানোর মাধ্যম গণ্য হচ্ছে, কিছু রীতি-নীতি, আনুষ্ঠানিকতাকেই ইসলাম মনে করা হচ্ছে। আকিদা ভুল হওয়ার কারণে ইসলামের সঠিক ব্যবহার হচ্ছে না, ফলে আমরা আজ পৃথিবীর নিকৃষ্টতম জাতিতে পরিণত হয়েছি। অন্য সমস্ত জাতি, পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র আমাদের গণহত্যা করছে, আমাদের বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে, আমাদের পর্দানশিন মা-বোনদের ধর্ষণ করছে, হাজারে হাজারে আমাদের মসজিদ ধ্বংস করে দিচ্ছে। আর নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক হানাহানি, অবিশ্বাস, দ্বন্দ্ব, অনৈক্য, অশিক্ষা, কুসংস্কার ইত্যাদির মধ্যে ডুবে আছি অর্থাৎ অশান্তির মধ্যে আছি। অশান্তির মধ্যে আছি মানেই ইসলামে (ইসলাম শব্দের আক্ষরিক অর্থই শান্তি) নেই।

এখন এই লানত, শাস্তি থেকে পরিত্রাণের একটাই পথ, আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থায় ফিরে যাওয়া। সেই প্রকৃত, অনাবিল, শান্তিদায়ক, নিখুঁত, ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা আল্লাহর প্রেরিত সর্বশেষ নবী মোহাম্মদ (সা.) এর মাধ্যমে আল্লাহ যেটা পাঠিয়েছিলেন সেটাকোথায় পাওয়া যাবে? সেটা আল্লাহ হেযবুত তওহীদকে দান করেছেন। আজ সারা পৃথিবীতে আকিদা ভুলে যাওয়ার কারণে ইসলামকে যেভাবে চর্চা করা হচ্ছে, মসজিদ, মাদ্রাসা, মক্তবে, খানকায় যেভাবে ইসলাম শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে সেটা আল্লাহর দেওয়া প্রকৃত ইসলাম নয়। ফলে ১৬০ কোটির এই জনসংখ্যা শান্তিতে নেই, অন্য জাতির গোলামী করে যাচ্ছে। আমরা ইসলামের প্রকৃত আকিদা সমস্ত মানবজাতির সামনে তুলে ধরছি, এই আকিদা ফিরে পেলে আমরাই সমস্ত মানবজাতিকে পরিপূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা দিতে পারব, সমস্ত মানবজাতিকে একটি পরিবারে পরিণত করতে পারব ইনশা'আল্লাহ।

লেখক: শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক, হেযবুত তওহীদ

ইসলাম প্রত্যাশীদের করণীয়

রিয়াদুল হাসান

সমাজতন্ত্রের পতন হয়েছে বহুদিন হলো, পুঁজিবাদি গণতন্ত্রও মানবজাতির আশা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। এমতাবস্থায় মানবজাতি আবারও আদর্শের সংকটে পড়েছে। কারণ তারা ধর্মকে তো জীবনব্যবস্থা হিসাবে বহু আগেই বাদ দিয়েছে, আর মানুষের তৈরি করে নেওয়া জীবনব্যবস্থাগুলোও একে একে ব্যর্থ হয়ে গেল। আদর্শের এই মহা-সংকটকালে সৃষ্টি হয়েছে সভ্যতার সংঘাত (The Clash of Civilizations)। এখানে মুসলিম জাতিকে পাশ্চাত্য পরাশক্তিগুলো প্রতিপক্ষ হিসাবে গ্রহণ করেছে। তারা জঙ্গিবাদকে শাখের করাত হিসাবে ব্যবহার করছে। আফগান রাশিয়ার যুদ্ধ থেকে শুরু করে ইরাক, কুয়েত, আফগানিস্তান, সিরিয়া, লিবিয়া, ফিলিস্তিন সর্বত্র চলছে লাখে লাখে মুসলিম নিধন। ছয় কোটি মুসলমান এখন উদ্বাস্তু। মানবজাতি একটি যুগসন্ধিক্ষণে উপনীত হয়েছে যখন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ চূড়ান্ত রূপ ধারণ করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। যুদ্ধক্ষেত্র দিন দিন বিস্তৃত হচ্ছে, জড়িয়ে যাচ্ছে নতুন নতুন দেশ। এমন একটি সময়ে যারা ইসলামকে মানবজাতির জন্য বিকল্প জীবনব্যবস্থা হিসাবে প্রস্তাব করতে চান তাদের ইসলামকে অবশ্যই যুগোপযোগী করেই উপস্থাপন করতে হবে। হাজার বছর আগের সমাজের সমস্যাগুলো তার রূপ পরিবর্তন করেছে, এখন বিশ্ব অনেক এগিয়েছে, মানুষ অনেক যুক্তিশীল, চিন্তাশীল। তারা যে কোনো মতবাদকেই অন্ধভাবে গ্রহণ করবে এমন যুগ আর নেই, বিশেষ করে ধর্মকে তো নয়ই। কেউ যদি জোর করে এটা মানুষের উপরে চাপিয়ে দিতে চান সেটা কখনোই সফল হবে না। কারণ প্রথমত তাদের প্রতিপক্ষ এতটাই শক্তিশালী যে তাদের গায়ে আঁচড় কাটার ক্ষমতাও এদের হবে না। দ্বিতীয়ত, প্রতিপক্ষ যত শক্তিশালীই হোক তারা পারতো যদি আল্লাহর সাহায্য তারা লাভ করত। কিন্তু সেটা তারা পাচ্ছে না ও পাবে না, কারণ তাদের কাছে থাকা ইসলামটা আল্লাহ-রসুলের প্রকৃত ইসলাম নয় যে সেটা প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে আল্লাহ প্রতিষ্ঠাকারীদের সংগ্রামে সাহায্য করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। তৃতীয়ত জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার এই নীতিটা ইসলাম সমর্থন করে না, বরং এটা ইসলামের নীতি "এই দীনে কোনো জবরদস্তি নেই"- এর সরাসরি লংঘন।

তাই নিজেদের পছন্দকে মানবজাতির উপরে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে লাভ নেই, বরং ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাটিকে তুলে ধরাই হচ্ছে সঠিক উপায়। সেটা তাদের কাছে নেই বলেই তারা নিজেরাই আজও ঐক্যবদ্ধ হতে পারে নাই। অথচ আল্লাহর রসুল সর্বপ্রথম চেষ্টা করেছেন দলমত নির্বিশেষে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতিসত্তা গড়ে তুলতে। ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য যারা চেষ্টা করছেন তারাই হাজারো দল-মত-পথে বিভক্ত। তারাই শিয়া সুন্নী ফেরকা নিয়ে মারামারিতে ব্যস্ত। তারা কেউ হানাফি, কেউ হাম্বলি, কেউ শাফেয়ি, কেউ মালেকি। কোর'আনের মূলনীতি ত্যাগ করে বিভিন্ন মাজহাবের ফকীহ মোফাসসেরদের তৈরি করা শরিয়তকে প্রতিষ্ঠা করতে চাওয়া এই দলগুলো বুঝতে অক্ষম যে তাদের ওসব মাসলা মাসায়েল আর বিকোবে না। তাদেরকে এমন এক যৌক্তিক ইসলাম তুলে ধরতে হবে যা একাধারে প্রচলিত ইসলামের বিকৃতিগুলোকেও প্রকাশ করে তা থেকে মানুষকে পরিশুদ্ধ করবে, পাশাপাশি গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্রের অসারতাকে যৌক্তিকভাবে তুলে ধরবে এবং ইসলাম কীভাবে সেগুলোর সমাধান করতে সক্ষম সে রূপরেখাও তুলে ধরবে। নিজেদের বক্তব্যের, বিধানের প্রতিটি শব্দের যৌক্তিকতার প্রমাণ দিতে হবে। আরবীয় ভাষা, আরবীয় পোশাক ইসলামের নাম করে সারা দুনিয়ায় চাপিয়ে দিতে চায় যে ইসলাম তা আর কেউ নিবে না। মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকতে হবে, নিজস্ব সংস্কৃতি পালনের অধিকার, নিজের পছন্দনীয় পোশাক পরিধান করার স্বাধীনতা থাকতে হবে, নিজস্ব বিশ্বাস লালন ও প্রচারের অধিকার বিধিবদ্ধ থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে, যুগের চাহিদা মেটানোই ধর্মের বৈশিষ্ট্য। তা যদি না হতো তাহলে যুগে যুগে একলক্ষ চব্বিশ হাজার নবী রসুল মানবজাতির সমস্যার যুগোপযোগী সমাধান নিয়ে আসতেন না। এক নবীর মাধ্যমে পাঠানো জীবনব্যবস্থা দিয়েই কেয়ামত পর্যন্ত মানবজাতি চলতে পারতো।

ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য যারা চেষ্টা করছেন তারাই হাজারো দল-মত-পথে বিভক্ত। তারাই শিয়া সুন্নী ফেরকা নিয়ে মারামারিতে ব্যস্ত। তারা কেউ হানাফি, কেউ হাম্বলি, কেউ শাফেয়ি, কেউ মালেকি। কোর'আনের মূলনীতি ত্যাগ করে বিভিন্ন মাজহাবের ফকীহ মোফাসসেরদের তৈরি করা শরিয়তকে প্রতিষ্ঠা করতে চাওয়া এই দলগুলো বুঝতে অক্ষম যে তাদের ওসব মাসলা মাসায়েল আর বিকোবে না।

এখন যুগের চাহিদা কী? এই যুগে কীসের অভাব? প্রাচুর্য্যের অভাব নেই, খনিজ সম্পদের অভাব নেই, সমরাস্ত্রের অভাব নেই, জনসংখ্যার অভাব নেই। অভাব এক শক্তিশালী আদর্শের যে আদর্শ মানুষের আত্মিক চাহিদা থেকে শুরু করে বাস্তব জীবনের সকল বাস্তব সমস্যার সমাধান দিতে পারবে। সকল চাহিদা পূরণ করতে পারবে। এটা দিতে পারে মহান আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় নবী, শেষ নবী মোহাম্মাদুর রসুলাল্লাহ (সা.) এর প্রকৃত ইসলাম যা হেযবুত তওহীদ উপস্থাপন করছে।

লেখক: সাহিত্য সম্পাদক, দৈনিক বজ্রশক্তি

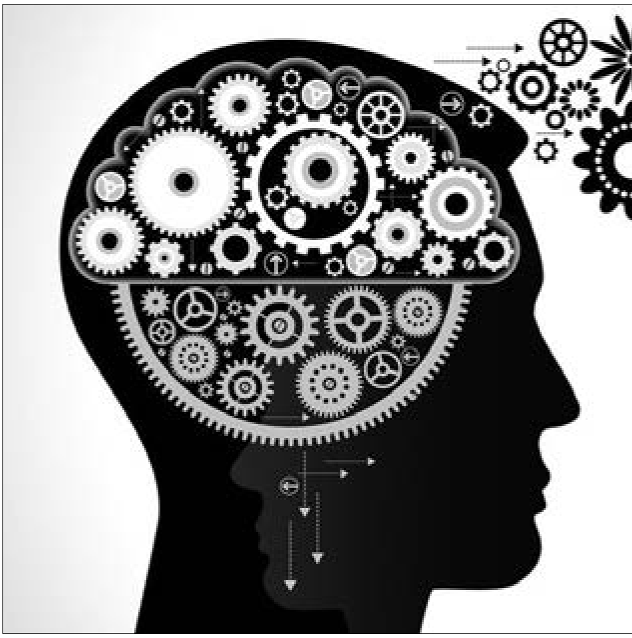

মো'মেন কখনও যুক্তি

রিয়াদুল

আধুনিক জ্ঞানে-বিজ্ঞান, যুক্তি, বুদ্ধি, প্রযুক্তির এই যুগে এসে যখন তথ্য যাচাই বাছাইয়ের প্রতিটি মাধ্যম মানুষের হাতের মুঠোয়, এমন একটি পর্যায়ে মানবজাতি পৌঁছানোর পর মুসলমানদেরকে কতগুলো বিষয় অনুধাবন করতে হবে। এখনও সাধরণ মুসলমানদের মধ্যে গুজব শুনে হুজুগে মেতে ওঠার প্রবণতা ব্যাপকভাবে রয়েছে। কিন্তু গুজব আর হুজুগ কখনওই কোনো শুভফল বয়ে আনে না, এ দিয়ে স্বার্থান্বেষীর স্বার্থ উদ্ধার হয় মাত্র। ভাবতে অবাক লাগে মুসলমানেরা কী করে হুজুগ আর গুজবে অভ্যস্ত হয়ে উঠলো! একটা গুজব ছড়িয়ে দেয়া হয় আর মুহূর্তের মধ্যে হাজার হাজার মানুষ হৈ হৈ রৈ রৈ করে ধ্বংসাত্মক ও সহিংস কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়। এতে বদনাম হয় ধর্মের, অবমাননা হয় আল্লাহর, রসুলের। রসুলাল্লাহ এক মহান রেনেসাঁ সংঘটন করে শত শত বছর দীর্ঘস্থায়ী একটি স্বর্ণোজ্জ্বল সভ্যতা নির্মাণ করেছিলেন, সেটা হুজুগের দ্বারা, গুজবের দ্বারা করা সম্ভব নয়। তিনি এমন হালকা চরিত্রের মানুষ ছিলেন না যে ক্ষণস্থায়ী একটি উত্তেজনা সৃষ্টি করে কার্যসিদ্ধি করে নিবেন।

শোনা কথায় কান দিয়ে আকস্মিক আবেগের বশে কোনো বড় ঘটনা সংঘটনের বৈধতাকে ইসলাম নাকোচ করে দেয়। এটা রসুলাল্লাহর জীবনের বহু ঘটনায় বার বার আমরা দেখতে পেয়েছি। আল্লাহ বলেছেন- মো'মেনগণ! যদি কোনো পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোনো সংবাদ আনয়ন করে, তবে তোমরা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা কোনো সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত না হও (সুরা হুজরাত-৬)। আর আল্লাহর রসুল (সা.) বলেছেন, কোনো মানুষের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যাই শোনে তাই যাচাই না করেই অন্যের কাছে বর্ণনা করে দেয়।" (হাদীস-মুসলিম)।

রসুলাল্লাহর জীবনে এমন একটি ঘটনাও নেই যেখানে সাহাবীরা গুজবে মেতে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ক্ষতিসাধন করেছেন। এমন কি যুদ্ধের সময়ও তারা অত্যন্ত সতর্ক থেকেছেন যেন কোনো বেসামরিক ব্যক্তি, নারী, শিশু, বৃদ্ধের উপর আঘাত না লাগে। কোনো ক্ষেত্রে যেমন মক্কা বিজয়ের সময় কিছু লোককে খালেদ (রা.) ভুল করে হত্যা করে ফেলেন। খবর জানতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর রসুল আল্লাহর দরবারে নিজেকে এই ঘটনার সাথে অসম্পৃক্ত বলে ঘোষণা করেন এবং খালেদের এই ভুলের জন্য আল্লাহর কাছে পানাহ চান। তারপর নিহতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করেন।

তাই এটা একটা বিরাট প্রশ্ন যে উম্মতে মোহাম্মদী দাবি করে আজকের জাতিটি গুজব নির্ভর হয়ে গেল কী করে? কী তাদের এমন অন্ধ আবেগে উন্মাদনাপ্রবণ করে তুললো? ইসলাম এমন একটি দীন যার মধ্যে অন্ধবিশ্বাসের জায়গা নেই। আল্লাহ মানুষকে মস্তিষ্ক দিয়েছেন যেন সে চিন্তা করে। মস্তিষ্কের এই ক্ষমতা পশুকে দেওয়া হয় নি। তাকে হৃদয় দেওয়া হয়েছে অনুধাবন করার জন্য, এটা পশুকে দেওয়া হয় নি। মানুষকে চোখ দেয়া হয়েছে দেখার জন্য, কান দেয়া হয়েছে শোনার জন্য। সে কেন দেখবে না, সে কেন শুনবে না। সে কেন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যাচাই করে দেখবে না। যদি না করে তাহলে এগুলো দেওয়া অর্থহীন হয়ে গেল। সুতরাং একজন মো'মেন কখনও অন্ধের মতো কাজ করতে পারে না।

এই কথা অনস্বীকার্য যে, আল্লাহর রসুল মোহাম্মদ (সা.) তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্ব (সমস্ত পৃথিবীতে এই শেষ দীন প্রতিষ্ঠা) পূরণ করার জন্য যে জাতিটি তৈরি করেছিলেন সেই জাতির ইসলাম সম্পর্কে আকিদা আর বর্তমানের পৃথিবীজুড়ে মৃত দেহের মতো পড়ে থাকা লাঞ্ছিত মুসলিম নামে এ জাতির আকিদার মাঝে আকাশ পাতালের ফারাক বিদ্যমান। ধর্মজীবী তথাকথিত আলেম, পুরোহিত শ্রেণির খপ্পরে পড়ে দীন আজ বিকৃত এবং বিপরীতমুখী আকার ধারণ করেছে। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এমন কোন বিষয় নেই যেখানে এই বিকৃতি পৌঁছায় নি। আর এরই ধারাবাহিকতায় দীন আজ অন্ধ বিশ্বাসের অলীক ধ্যান-ধারণায় পরিণত

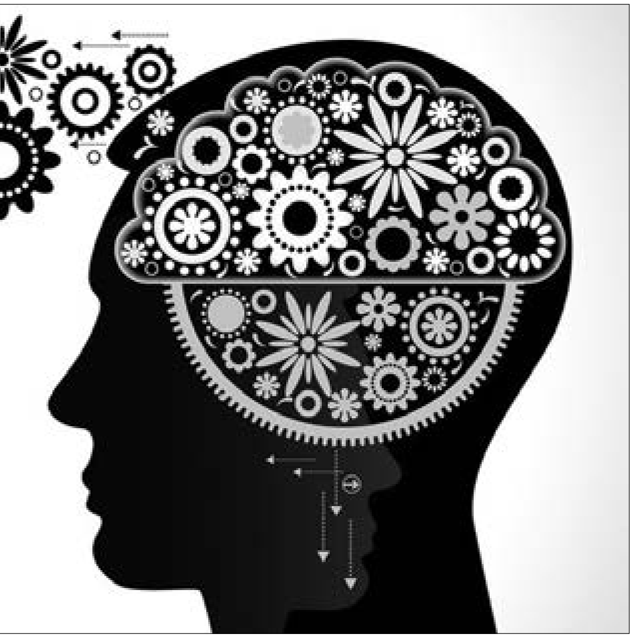

বোধহীন হতে পারে না

হাসান

হয়েছে। বাস্তবে ইসলাম কোনো অন্ধভাবে বিশ্বাসের বিষয় নয়, প্রকৃত ইসলাম হচ্ছে উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। আর তাই যুক্তি দিয়েই ইসলামকে নিরীক্ষণ করতে হয়। আল্লাহর কোর'আন যিনি ভাসাভাসাভাবেও একবার পড়ে গেছেন তিনিও লক্ষ না করে পারবেন না যে, চিন্তা-ভাবনা, যুক্তির উপর আল্লাহ কত গুরুত্ব দিয়েছেন। "তোমরা কি দেখ না? তোমরা কি চিন্তা করো না?" এমন কথা কোর'আনে এতবার আছে যে সেগুলোর উদ্ধৃতির কোনো প্রয়োজন পড়ে না। এখানে শুধু দু'একটি কথা বলছি এর গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য। চিন্তা-ভাবনা, কারণ ও যুক্তির উপর আল্লাহর এতখানি গুরুত্ব দেওয়া থেকেই প্রমাণ হয়ে যায় যে এই দীনে অন্ধ বিশ্বাসের কোনও স্থান নেই। তারপরও তিনি সরাসরি বলছেন-"যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নেই (অর্থাৎ বোঝ না) তা গ্রহণ ও অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই তোমাদের শোনার, দেখার ও উপলব্ধির প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়কে প্রশ্ন করা হবে (সুরা বনি ঈসরাইল ৩৬)।" কোর'আনের এ আয়াতের কোন ব্যাখ্যা প্রয়োজন পড়ে না। অতি সহজ ভাষায় আল্লাহ বলছেন জ্ঞান, যুক্তি-বিচার না করে কোনো কিছুই গ্রহণ না করতে।

অন্য বিষয়ে তো কথাই নেই, সেই মহান স্রষ্টা তাঁর নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও কোর'আনে বহুবার বহু যুক্তি দেখিয়েছেন। তারপর তাঁর একত্ব, তিনি যে এক, তাঁর কোনো অংশীদার, সমকক্ষ নেই, অর্থাৎ একেবারে তাঁর ওয়াহদানিয়াত সম্পর্কেই যুক্তি তুলে ধরেছেন। বলছেন- "বল (হে মোহাম্মদ), মুশরিকরা যেমন বলে তেমনি যদি (তিনি ছাড়া) আরও উপাস্য (ইলাহ) থাকতো তবে তারা তাঁর সিংহাসনে (আরশে) পৌছতে চেষ্টা করতো (সুরা বনি ইসরাইল ৪২)। আবার বলছেন- "আল্লাহ কোনো সন্তান জন্ম দেন নি; এবং তাঁর সাথে আর অন্য কোনও উপাস্য (ইলাহ) নেই, যদি থাকতো তবে প্রত্যেকে যে যেটুকু সৃষ্টি করছে সে সেইটুকুর পৃষ্ঠপোষকতা করতো এবং অবশ্যই কতগুলি (উপাস্য) অন্য কতকগুলির (উপাস্য) উপর প্রাধান্য বিস্তার করতো (সুরা আল-মো'মেনুন ৯১)।" এমনি আরও বহু আয়াত উল্লেখ করা যায় যেগুলিতে আল্লাহ মানুষের জ্ঞান, বিবেক, যুক্তির, চিন্তার প্রাধান্য দিয়েছেন, সব কিছুতেই সেগুলো ব্যবহার করতে বলেছেন, চোখ-কান বুঁজে কোন কিছুই অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ যেমন একেবারে তাঁর নিজের অস্তিত্ব ও একত্বের ব্যাপারেও যুক্তি উপস্থাপন করেছেন, তেমনি তাঁর রসুল (সা.) তাঁর ঈমান অর্থাৎ বিশ্বাসের ব্যাপারেও বলছেন- 'আমার ঈমানের ভিত্তি ও শেকড় হলো যুক্তি'। এরপর ইসলামে আর অন্ধ বিশ্বাসের কোন জায়গা রইল কোথায়? অন্ধবিশ্বাস তো দূরের কথা আল্লাহ ও রসুলের (সা.) প্রেমে ও শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়েও যে যুক্তিকে ত্যাগ করা যাবে না, তা তাঁর উম্মাহকে শিখিয়ে গেছেন মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক। একটি মাত্র শিক্ষা এখানে উপস্থাপন করছি। উহুদের যুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় তাঁর তলোয়ার উঁচু করে ধরে বিশ্বনবী (সা.) বললেন- "যে এর হক আদায় করতে পারবে সে এটা নাও।" ওমর বিন খাত্তাব (রা.) লাফিয়ে সামনে এসে হাত বাড়িয়ে বললেন-"ইয়া রসুলাল্লাহ! আমাকে দিন, আমি এর হক আদায় করব।" মহানবী (সা.) তাকে তলোয়ার না দিয়ে অন্যদিকে ঘুরে আবার বললেন- "যে এর হক আদায় করতে পারবে সে নাও।" এবার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহাবা যুবায়ের বিন আল আওয়াম (রা.) লাফিয়ে এসে হাত বাড়ালেন- "আমি এর হক আদায় করব।" আল্লাহর রসুল (সা.) তাকেও তলোয়ার না দিয়ে অন্যদিকে ঘুরে আবার ঐ কথা বললেন, এবার আনসারদের মধ্যে থেকে আবু দুজানা (রা.) বিশ্বনবীর (সা.) সামনে এসে প্রশ্ন করলেন- "হে আল্লাহর রসুল! এই তলোয়ারের হক আদায়ের অর্থ কী?" রসুলাল্লাহ জবাব দিলেন- "এই তলোয়ারের হক হচ্ছে এই যে এটা দিয়ে শত্রুর সঙ্গে এমন প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধ করা যে এটা দুমড়ে, ভেঙ্গে চুরে যাবে।" আবু দুজানা (রা.) বললেন- "আমায় দিন, আমি এর হক আদায় করব।" বিশ্বনবী (সা.) আবু দুজানা (রা.) হাতে তাঁর তলোয়ার উঠিয়ে দিলেন (হাদিস ও সীরাতে রসুলাল্লাহ- মোহাম্মাদ বিন ইসহাক)।

একটা অপূর্ব দৃষ্টান্ত, শিক্ষা যে, অন্ধবিশ্বাস ও আবেগের চেয়ে ধীর মস্তিষ্ক, যুক্তির স্থান কত উর্ধ্বে। ওমর (রা.) ও যুবায়ের (রা.) এসেছিলেন আবেগে, স্বয়ং নবীর (সা.) হাত থেকে তাঁরই তলোয়ার! কত বড় সম্মান, কত বড় বরকত ও সৌভাগ্য। ঠিক কথা, কিন্তু আবেগের চেয়ে বড় হলো যুক্তি, জ্ঞান। তারা আবেগে ও ভালোবাসায় জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেলেন যে, মহানবী (সা.) যে হক আদায় করার শর্ত দিচ্ছেন, সেই হকটা কী? আবু দুজানার (রা.) আবেগ ও ভালোবাসা কম ছিল না। কিন্তু তিনি আবেগে যুক্তিহীন হয়ে যান নি, প্রশ্ন করেছেন- কী ঐ তলোয়ারের হক? হকটা কী তা না জানলে কেমন করে তিনি তা আদায় করবেন? বিশ্বনবী (সা.) যা চাচ্ছিলেন আবু দুজানা (রা.) তাই করলেন। যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন করলেন এবং তাকেই তাঁর তলোয়ার দিয়ে সম্মানিত করলেন। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে যুক্তিকে প্রাধান্য না দেওয়ায় মহানবী (সা.) প্রত্যাখ্যান করলেন কাদের? একজন তাঁর শ্বশুর এবং ভবিষ্যৎ খলিফা, অন্যজন শ্রেষ্ঠ সাহাবাদের অন্যতম এবং দু'জনেই ঐতিহাসিকদের হিসাব মোতাবেক আশআরা মোবাশশারার অন্তর্ভুক্ত, অন্যদিকে আবু দুজানা (রা.) এসব কিছুই নন, একজন সাধারণ আনসার। তবু যুক্তিকে প্রাধান্য দেয়ায় ঐ মহা সম্মানিত সাহাবাদের বাদ দিয়ে তাকেই সম্মানিত করলেন। প্রশ্ন হচ্ছে- আবু দুজানার (রা.) আবেগ, বিশ্বনবীর (সা.) প্রতি তার ভালোবাসা কি ওমর (রা.) বা যুবায়েরের (রা.) চেয়ে কম ছিল? না, কম ছিল না, তার প্রমাণ বিশ্বনবীর (সা.) দেয়া তলোয়ারের হক তিনি কেমন করে আদায় করেছিলেন তা ইতিহাস থেকে পাওয়া যায়।

ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেছেন- আল্লাহর রসুল (সা.) বললেন- 'কোনো মানুষ নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত, ওমরা (ইবনে ওমর (রা.) উল্লেখ করছেন যে ঐগুলি তিনি একে একে এমনভাবে বলতে লাগলেন যে, মনে হলো কোন আমলের কথাই তিনি (সা.) বাদ রাখবেন না) ইত্যাদি সবই করল কিন্তু কেয়ামতের দিন তার 'আকলের' বেশি তাকে পুরস্কার দেয়া হবে না (ইবনে ওমর (রা.) থেকে- আহমদ, মেশকাত)। রসুলাল্লাহ (সা.) শব্দ ব্যবহার করেছেন 'আকল', যে শব্দটাকে আমরা বাংলায় ব্যবহার করি 'আক্কেল' বলে, অর্থাৎ মানুষের বুদ্ধি, সাধারণ জ্ঞান, যুক্তি ইত্যাদি, আবু দুজানা (রা.) যেটা ব্যবহার করে নবীকে (সা.) প্রশ্ন করেছিলেন তলোয়ারের কী হক? অর্থাৎ বিচারের দিনে মানুষের আমলের সওয়াবই শুধু আল্লাহ দেখবেন না, দেখবেন ঐ সব কাজ বুঝে করেছে, নাকি গরু-বকরীর মতো না বুঝে করে গেছে এবং সেই মতো পুরস্কার দেবেন, কিম্বা দেবেন না। অর্থাৎ কারণ ও উদ্দেশ্য না বুঝে বে-আক্কেলের মতো নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত, ইত্যাদি সব রকম সওয়াবের কাজ শুধু সওয়াব মনে করে করে গেলে কোন পুরস্কার দেওয়া হবে না।

এই হাদিসটাকে সহজ বাংলায় উপস্থাপন করলে এই রকম দাঁড়ায়- 'বিচারের দিনে পাক্কা নামাজীকে আল্লাহ প্রশ্ন করবেন- নামাজ কায়েম করেছিলে? মানুষটি জবাব দেবে-হ্যাঁ আল্লাহ! আমি সারা জীবন নামাজ পড়েছি। আল্লাহ বলবেন-ভালো! কেন পড়েছিলে? লোকটি জবাব দেবে- তুমি প্রভু। তোমার আদেশ, এই তো যথেষ্ট, তুমি হুকুম করেছ তাই পড়েছি। আল্লাহ বলবেন- আমি হুকুম ঠিকই করেছি। কিন্তু কেন করেছি তা কি বুঝেছ? তোমার নামাজে আমার কি দরকার ছিল? আমি কি তোমার নামাজের মুখাপেক্ষী ছিলাম বা আছি? কী উদ্দেশ্যে তোমাকে নামাজ পড়তে হুকুম দিয়েছিলাম তা বুঝে কি নামাজ পড়েছিলে?" তখন যদি ঐ লোক জবাব দেয়- না। তাতো বুঝি নি, তবে মহানবীর (সা.) কথা মোতাবেক তার ভাগ্যে নামাজের কোন পুরস্কার জুটবে না। আর যে মানুষ আল্লাহর প্রশ্নের জবাবে বলবে- হ্যাঁ আল্লাহ, আমি বুঝেই নামাজ পড়েছি। তোমার রসুলকে (সা.) তুমি দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলে সমস্ত মানবজাতির উপর তোমার দেয়া জীবন-ব্যবস্থা, দীনকে সর্বাত্মক সংগ্রামের মাধ্যমে জয়ী করে পৃথিবী থেকে সব রকম অন্যায়, শোষণ, অবিচার, যুদ্ধ ও রক্তপাত দূর করে শান্তি (ইসলাম) প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দিয়ে। তাঁর একার পক্ষে এবং এক জীবনে এ কাজ সম্ভব ছিল না। তাঁর প্রয়োজন ছিল একটা জাতির, একটা উম্মাহর, যে জাতির সাহায্যে এবং সহায়তায় তিনি তাঁর উপর দেয়া দায়িত্ব পালন করতে পারেন এবং তাঁর তোমার কাছে প্রত্যাবর্তনের পর যে উম্মাহ তার সংগ্রাম চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়, যে পর্যন্ত না তাঁর দায়িত্ব পূর্ণ হয় এবং ইবলিস তোমাকে দুনিয়ায় ফাসাদ আর রক্তপাতের যে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল, তাতে তুমি জয়ী হও। সৌভাগ্যক্রমে, তোমার অসীম দয়ায়, আমি সেই উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। তোমার আদেশ নামাজের উদ্দেশ্য ছিল আমার সেই রকম চরিত্র সৃষ্টি করা, সেই রকম আনুগত্য, শৃঙ্খলা শিক্ষা করা যে চরিত্র ও শৃঙ্খলা হলে আমি তোমার নবীর (সা.) দায়িত্ব সম্পাদনে তাঁর সাহায্যকারী হয়ে সংগ্রাম করতে পারি। তাই আমি বুঝেই নামাজ পড়েছি। এই লোক পাবে তার নামাজের পূর্ণ পুরস্কার।

আজকের আমরা মুসলিমরা যে দিন-রাত নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি হাজারো রকমের ইবাদত-উপাসনা নিয়ে ব্যস্ত আছি আমাদের এই আকিদাহীন, উদ্দেশ্যহীন, সামগ্রিক ধারণাহীন (comprehensive concept) আমলের কতটুকু দাম আমরা আল্লাহর কাছে থেকে পাব তা এখন ভাবার সময় এসেছে।

লেখক: সাহিত্য সম্পাদক, দৈনিক বজ্রশক্তি

WWW.HEZBUTTAWHEED.ORG

রসুলাল্লাহ (সা.) এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে অবহেলিত, উপেক্ষিত, পশ্চাৎপদ আরব জাতি জ্ঞান-বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সামরিক শক্তিসহ সকল বিষয়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম জাতিতে পরিণত হয়েছিল। অনুরূপভাবে আজ বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত

এ জাতির পায়ে
লুটিয়ে পড়বে বিশ্ব

ষোল কোটি বাঙালিকে হেযবুত তওহীদ আহ্বান করছে, যদি কলেমা-তওহীদে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার একটি মাত্র শর্ত পূরণ করা হয় তবে এ জাতির পায়ে লুটিয়ে পড়বে বিশ্ব।

তওহীদ প্রকাশন
৩১/৩২, পি.কে. রায় রোড, পুস্তক ভবন, বাংলাবাজার, ঢাকা।

: 01782188237 | 01670174643 | 01711005025 | 01933767725

জাতি পথ হারাল যেভাবে

হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম

পৃথিবীর প্রথম মানুষ আদম (আ.) থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মানবজাতির ইতিহাসকে যদি কেউ একটি বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশ করতে বলে তাহলে আমি বলব- মানুষের ইতিহাস আর কিছু নয়, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা ও শান্তি-অশান্তির দ্বন্দ্বের ইতিহাস। এই দ্বন্দ্বের এক পক্ষে আছেন আল্লাহ স্বয়ং, অন্য পক্ষে ইবলিশ। আর মানুষ স্বাধীন। মানুষ আল্লাহর পক্ষও নিতে পারে, ইবলিশের পক্ষও নিতে পারে। কোন পক্ষ নিলে কী ফল ভোগ করতে হবে, কোন পক্ষ তাকে পৃথিবীতে শান্তি ও পরকালে জান্নাতে নিয়ে যাবে আর কোন পক্ষ পৃথিবীতে অশান্তি-রক্তপাত ও পরকালে জাহান্নামের দিকে ঠেলে দিবে- তার জ্ঞান আল্লাহ যুগে যুগে মানুষকে প্রদান করেছেন নবী-রসুল পাঠিয়ে।

এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, চূড়ান্ত সত্য হচ্ছেন আল্লাহ। তাঁর পক্ষ থেকে যা-ই আসে সবই সত্য থেকেই উৎসারিত, অর্থাৎ ন্যায়। আর ন্যায় থেকে আসে শান্তি। তাই যুগে যুগে মানুষ যখনই আল্লাহকে একমাত্র হুকুমদাতা হিসেবে গ্রহণ করে আল্লাহর নির্দেশিত হেদায়াহর অনুসরণ করেছে তার অনিবার্য ফলাফল হিসেবে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অন্যদিকে আল্লাহর হুকুম থেকে সরে গেলে অশান্তি ও রক্তপাতে নিমজ্জিত হয়েছে। আল্লাহ চান মানুষ তাঁর হুকুম মেনে শান্তিতে থাকুক, ইবলিশ চায় মানুষ আল্লাহর হুকুম থেকে সরে গিয়ে অশান্তিতে পতিত হোক। এই হেদায়াত-দালালাত, সত্য-মিথ্যা ও শান্তি-অশান্তির দ্বন্দ্বের ধারাবাহিকতায় সমস্ত দুনিয়া থেকে ফাসাদ ও সাফাকুদ্দিমা দূর করে ন্যায়, শান্তি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, ন্যায়-অন্যায়ের দ্বন্দ্বে ন্যায়কে পূর্ণরূপে বিজয়ী করার লক্ষ্যে আজ থেকে ১৪০০ বছর আগে আল্লাহ পৃথিবীতে পাঠালেন বিশ্বনবী, শেষ নবী মোহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহকে (সা.)।

ধরাপৃষ্ঠে আবির্ভূত হয়ে আল্লাহর রসুল মানবজাতির ইতিহাসের বিস্ময়কর এক বিপ্লব ঘটালেন। আপসহীন সংগ্রাম চালিয়ে সীমাহীন বর্বরতা, চরম নৈরাজ্য ও ভয়াবহ অশান্তি-রক্তপাতে নিমজ্জিত আরব উপদ্বীপের চিত্র পুরোপুরি পাল্টে দিয়ে শান্তির সুবাতাস বইয়ে দিলেন। দূর হলো আইয়ামে জাহেলিয়াতের অভিশাপ। নেমে এলো ন্যায়, শান্তি, সম্প্রীতি ও সমৃদ্ধি। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না তিনি কেবল আরবের নবী নন, তিনি বিশ্বনবী, তাঁর দায়িত্ব কেবল আরব উপদ্বীপ নয়, সারা পৃথিবীতে সত্য প্রতিষ্ঠা করা। আবার এটাও সাধারণ জ্ঞানেই বোঝা যায় যে, এতবড় দায়িত্বের বাস্তবায়ন কোনো মানুষের একার পক্ষে এক জীবনে সম্ভব নয়। তাই আল্লাহর রসুল গড়ে তুললেন উম্মতে মোহাম্মদী নামক একটি অপরাজেয় সুশৃঙ্খল জাতি যেন তাঁর অবর্তমানেও জাতিটি সংগ্রাম চালিয়ে বাকি পৃথিবীতেও ন্যায়, শান্তি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এই জাতিটি যেন কোনো অবস্থাতেই তাঁর অর্পিত দায়িত্বটি ভুলে না যায়, তার জন্য বারবার সতর্ক করে গেলেন এই বলে যে, যে আমার সুন্নাহ (শান্তি প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম) ত্যাগ করবে সে আমার কেউ নয় আমিও তার কেউ নই, (আবু হোরায়রা (রা.) থেকে মুসলিম, মেশকাত) অর্থাৎ সোজা ভাষায় উম্মতে মোহাম্মদী থেকে বহিষ্কার। বহিষ্কার হওয়াটাই স্বাভাবিক, কারণ যে উদ্দেশ্যে রসুলাল্লাহ সারাজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করে জাতিটি গঠন করলেন, তাঁর অবর্তমানে জাতি যদি ঐ কাজটিই ছেড়ে দেয় তাহলে আর রইল কী? যাই হোক, বিশ্বনবী উম্মতে মোহাম্মদী নামক জাতিটিকে বাকি পৃথিবীতে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দিয়ে আল্লাহর কাছে চলে গেলেন।

নেতার পৃথিবী থেকে চলে যাবার পর ঐ জাতিটি এক মুহূর্তও দেরি না করে তাদের নেতার অর্পিত দায়িত্ব অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর সিদ্দিক (রা.) খলিফা হবার পর প্রথম ভাষণেই জাতিকে নেতার বেঁধে দেওয়া লক্ষ্যের কথা স্মরণ করিয়ে বললেন, 'সংগ্রাম ছেড়ো না, যারা সংগ্রাম ত্যাগ করে আল্লাহ কিন্তু তাদেরকে অপদস্থ করে ছাড়েন।' (দেখুন- ইসলামের ইতিহাস, ইফাবা, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৫৫) তাঁর এই ভাষণ যে ঐ জাতি আত্মা দিয়ে উপলব্ধি করেছিল তার প্রমাণ- রসুলের ইন্তেকালের পর মাত্র ৬০/৭০ বছরের মধ্যে ঐ জাতিটি এক মহাবিপ্লবের জন্ম দিয়ে অর্ধেক দুনিয়ায় ন্যায়, সুবিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়। সামরিক শক্তিতে, অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতায়, সর্বদিক দিয়ে উম্মতে মোহাম্মদী তখন পৃথিবীর সুপার পাওয়ার, পৃথিবীর কর্তৃত্ব তখন এই জাতির হাতে এসে গেল। সুরা নুরের ৫৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ যে অঙ্গীকার করেছিলেন তার বাস্তবায়ন ঘটল। মো'মেনদেরকে তিনি পৃথিবীর শাসক বানালেন, দীনকে সুদৃঢ় করলেন, ভয় দূর করলেন, 'শান্তি' নাজেল করলেন। তবে মনে রাখতে হবে, তখনও বাকি অর্ধপৃথিবীতে চলছিল ফাসাদ ও সাফাকুদ্দিমা। উম্মতে মোহাম্মদী ঐ বাকি পৃথিবীতেও

শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে এমনটাই হবার কথা।

কিন্তু এমন সময় ঘটল এক দুঃখজনক ঘটনা। জাতি তার লক্ষ্য ভুলে গেল। শান্তি প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ছেড়ে শাসকরা মেতে উঠল ভোগ বিলাসিতায়। জাতি হয়ে পড়ল গতিহীন, স্থবির। আল্লাহর রসুল যে দায়িত্ব দিয়ে জাতিটিকে গড়ে তুলেছিলেন সেই দায়িত্বই যখন এই জাতি ভুলে গেল তখন আর এরা আল্লাহর চোখে উম্মতে মোহাম্মদী রইল না। নদীর স্রোত যতক্ষণ গতিশীল থাকে ততক্ষণ কোনো ময়লা-আবর্জনা জমতে পারে না, পানি থাকে নির্মল। যখন স্রোত থেমে যায় তখন ঐ স্থবির পানিতে ময়লা-আবর্জনা জমে বিষাক্ত করে দেয়। জাতির মধ্যেও একের পর এক বিষ জন্মাতে লাগল এবার। শুরু হলো পচনের কাল। যতক্ষণ জাতির সুস্পষ্ট লক্ষ্য ছিল ততক্ষণ তাদের মধ্যে কোনো মতভেদ, অনৈক্য ইত্যদি সৃষ্টি হতে পারে নি। সবাই এক দেহ এক প্রাণ হয়ে কেবল সংগ্রাম করে গেছে, আর আল্লাহ ততাঁরর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক বরাবরই বিজয় দান করে এসেছেন। কিন্তু এবার যখন সেই লক্ষ্যটা ভুলে যাওয়া হলো, এই প্রথম বিভিন্ন দিকে তাদের দৃষ্টি পড়তে লাগল, ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় তাদের দৃষ্টি আটকে যেতে লাগল। একদল শুরু করল দীনের চুলচেরা অতি বিশ্লেষণ। যে কোনো জিনিসের অতি বিশ্লেষণ খারাপ ফল বয়ে আনে। দীনের চুলচেরা বিশ্লেষণ যখন আরম্ভ হলো, স্বভাবতই তা থেকে নানা মতভেদের জন্ম হতে লাগল এবং সেগুলোকে কেন্দ্র করে ফেরকা-মাজহাব, দলাদলি, কোন্দল এমনকি ভ্রাতৃঘাতী রক্তারক্তি হতেও বাদ রইল না। বিশ্লেষণ, অতি বিশ্লেষণের ফলে সহজ-সরল দীন আর সাধারণ মানুষের বোধগম্য রইল না, দীন হয়ে উঠল দুর্বোদ্ধ। তখন দীন বোঝানোর জন্য অন্যান্য ধর্মের মত এই জাতিতেও গজিয়ে উঠল একদল পুরোহিত, পণ্ডিত শ্রেণি। আরেকদল ব্যস্ত হয়ে পড়ল আত্মার ঘষামাজা করে কুরবিয়াত হাসিলের কাজে। আর সাধারণ লোকেরা যে যার মত জীবনপ্রবাহে গা ভাসিয়ে দিল। ওদিকে বাকি পৃথিবী (আজকের উন্নত ইউরোপসহ) কিন্তু ডুবে আছে অন্যায়, অবিচার, অশান্তি, রক্তপাত, বর্বরতায়। এভাবে চলল প্রায় কয়েকশ' বছর, তবু জাতি নেতার অর্পিত দায়িত্ব বিস্মৃতই থেকে গেল।

আল্লাহ হয়তো এই সময়টুকু দিয়েছিলেন যেন এই জাতি পুনরায় তাদের আকীদা ফিরে পায়, যেন বাকি পৃথিবীর নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের আজাহারি শুনে হলেও তাঁদের নবীর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হয়, যেন গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পুনরায় সংগ্রাম শুরু করে। কিন্তু না, এই দীর্ঘ সময়েও জাতি শুধরোলো না। আল্লাহ বারবার করে সতর্ক করেছিলেন সত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ত্যাগ করলে, অভিযানে বের না হলে মর্মন্তুদ শাস্তি দেওয়া হবে, আল্লাহর রসুল বলেছেন যারা আমার সুন্নাহ ছেড়ে দিবে তারা আমার কেউ নয় আমি তাদের কেউ নই, খলিফার দায়িত্ব গ্রহণ করেই আবু বকর (রা.) বলেছিলেন, সংগ্রাম ছাড়লে কিন্তু আল্লাহ অপদস্থ না করে ছাড়বেন না- এর কিছুই যখন জাতির মনে রইল না, সব ভুলে গিয়ে যখন তারা তর্ক-বাহাস আর ফতোয়াবাজিতে মেতে থাকল, তখন আল্লাহ পুরোপুরি এই জাতির অভিভাবকত্ব ত্যাগ করলেন এবং ততাঁরর সুন্নাহ মোতাবেক, ঘোষণা মোতাবেক এদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন। সে শাস্তির কঠোরতা, ভয়াবহতা আজও হৃদয় কাঁপিয়ে দেয়! এককালে রোমান-পারস্য পরাশক্তিদ্বয়কে একইসাথে পরাজিত করে মানবজাতির ইতিহাসের অন্যতম বিস্ময়কর বিজয় অভিযানের মধ্য দিয়ে যে মুসলিমদের উত্থান হয়েছিল, সেই মুসলিম জাতির পচন তখন এতই তীব্র আকার ধারণ করেছিল যে, অসভ্য-বর্বর চেঙ্গিস খান, হালাকু খানদের হাত থেকে দুনিয়ার মানুষকে রক্ষা করা তো দূরের কথা, নিজেদের স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের জীবন রক্ষা

করার সামর্থ্যও তখন এদের নেই। হালাকু খানরা কচুকাটা করে গেল, এদের কর্তিত মস্তক স্তূপীকৃত করে পিরামিড বানালো, নারীদের বন্দী করল, খলিফাসুদ্ধ হত্যা করল আর দু'-একজন যারা রক্ষা পেল তারা মিশরসহ উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে পালিয়ে গেল। কিন্তু তবু এদের হুঁশ হলো না। তারা আবার ফিরে গেল সেই হুজরা, খানকায়। সেই বাহাস, তর্কাতর্কি, চুলচেরা বিশ্লেষণ, আধ্যাত্মিক ঘষামাজাই শুরু হলো নতুন উদ্যমে। ফলে এবার এলো চূড়ান্ত মার খাবার পালা।

এবার আর আশ্রয় নেবার জায়গা রইল না। ইউরোপীয় খৃষ্টান জাতিগুলো সামরিক শক্তিবলে এবার প্রায় সমগ্র মুসলিম জাতিটিকেই গোলাম বানিয়ে ফেলল। এদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সিস্টেম বদলে পাশ্চাত্যের তৈরি সিস্টেম কার্যকরি করল। যে ফিকাহর বই নিয়ে এত চুলচেরা বিশ্লেষণ, এত ফেরকাবাজি, ফতোয়াবাজি, আদালত থেকে সেই ফিকাহ-কোর'আন ছুঁড়ে ফেলে সেখানে দখলদার জাতিগুলোর তৈরি আইন-কানুন দণ্ডবিধি প্রয়োগ করা হলো। আল্লাহ আর এদের ইলাহ বা হুকুমদাতা থাকলেন না, ইলাহ হয়ে গেল ইউরোপীয়রা। যে জাতির জন্ম হলো সমস্ত পৃথিবী থেকে অন্যায়, অবিচার, শোষণ দূর করে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, খোদ সেই জাতিই ইউরোপীয়ানদের কাছে অন্যায়, অবিচার ও শোষণের শিকার হতে লাগল। পৃথিবীর মানুষকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য যাদের সৃষ্টি করা হয়েছিল তারাই আজ অন্য জাতির দাসে পরিণত হয়েছে। উম্মতে মোহাম্মদী থেকে তো বহু আগেই তারা খারিজ হয়ে গিয়েছিল, এবার যেন মুসলিম পরিচয়টিও মুছে যাবার পালা। কারণ জাতিগতভাবে তারা তো তখন ইউরোপের খৃষ্টান জাতিগুলোকে তসলিম করে নিতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু এই জাতির বিজয়ের ইতিহাস পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো ভালো করেই জানতো। তারা জানতো কোনোভাবে যদি এই জাতি আবার তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বুঝতে পারে, প্রকৃত আদর্শ ফিরে পায়, তাহলে সবকিছু বরবাদ হয়ে যাবে। তা হতে দেওয়া যাবে না। একবার যখন তাদেরকে পদানত করা গেছে, ভবিষ্যতেও যেন এই জাতি মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে না পারে তার ব্যবস্থাটি করে রাখতে হবে। তাই তারা সিদ্ধান্ত নিল এই জাতিকে এমন একটি ইসলাম শিক্ষা দিতে হবে যা বাইরে থেকে দেখতে প্রকৃত ইসলামের মতোই মনে হবে, কিন্তু ভেতরে, চরিত্রে, আত্মায় সেটা হবে আল্লাহ-রসুলের ইসলামের বিপরীত একটি দীন। দেখতে মনে হবে সত্যিকারের বন্দুক, কিন্তু বাস্তবে সেটা যাত্রাদলের কাঠের বন্দুক। ষড়যন্ত্রমূলক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে, নিজেরা সিলেবাস ও কারিকুলাম প্রণয়ন করে এবং নিজেরা খৃষ্টান হওয়া সত্ত্বেও মাদ্রাসার অধ্যক্ষপদে দায়িত্ব পালন করে [দেখুন- আলীয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, মূল- আ: সাত্তার, অনুবাদ- মোস্তফা হারুন, ই.ফা.বা. এবং Reports on Islamic Education and Madrasah Education in Bengal by Dr. Sekander Ali Ibrahimy (Islami Foundation Bangladesh)] এই জাতিকে তারা প্রায় এক শতাব্দী যাবৎ এমন একটি ইসলাম শিক্ষা দিল যাতে 'তওহীদ' ও শান্তি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামসহ ইসলামের বুনিয়াদী বিষয়গুলো পুরোপুরি উহ্য রাখা হলো এবং ছোট-খাটো গুরুত্বহীন বা কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও মাসলা-মাসায়েলকেই ইসলামের মহাগুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে চালিয়ে দেওয়া হলো। ফলে জাতির সংগ্রামী চেতনা বলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকল না। ওখান থেকে মাসলা-মাসায়েলসর্বস্ব ইসলাম শিখে যে পুরোহিত শ্রেণিটি বের হলো তাদের মগজে, চরিত্রে, মননে তখন অন্য ইসলাম। ঐ ইসলাম আর দুনিয়াকে শান্তি দিয়ে ইবলিশের চ্যালেঞ্জে আল্লাহকে জয়ী করার ইসলাম রইল না, ইসলাম হয়ে গেল জীবিকা উপার্জনের মাধ্যম। মাদ্রাসা থেকে বের হয়ে আলেম, পণ্ডিতরা নামাজ পড়িয়ে, কোর'আন খতম দিয়ে, ওয়াজ করে, তারাবি পড়িয়ে ইত্যাদিভাবে জীবিকা নির্বাহ করতে লাগলেন এবং ওরিয়েন্টালিস্টদের তৈরি ওই মাসলা-মাসায়েলসর্বস্ব বিকৃত ইসলামটাই জাতিকে শিক্ষা দিতে লাগলেন।

আল্লাহ-রসুলের প্রকৃত ইসলামে মো'মেন ছিলেন তারা যারা আল্লাহ ও রসুলের উপর ঈমান (তওহীদ) আনার পর আর কোনো সন্দেহ করেন নি এবং নিজেদের জীবন ও সম্পদ দিয়ে পৃথিবীময় শান্তি প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করে গেছেন (হুজরাত ১৫)। অন্যদিকে ইউরোপীয়রা যে ইসলাম শিক্ষা দিলো অর্থাৎ আমরা আজকে যে ইসলামের ধারক সেই ইসলামে মো'মেন হিসেবে পরিগণিত হবার জন্য তওহীদ লাগে না, শান্তি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামও লাগে না, জীবন-সম্পদও উৎসর্গ করতে হয় না, শুধু দাড়ি-টুপি-জোব্বা থাকলেই হয়। বিশ্বনবীর ইসলামে ইলাহ বলতে বোঝাত সমষ্টিগত জীবনে যার হুকুম মানতে হবে, এই ইসলামে ইলাহ বলতে বোঝায় ব্যক্তিগত জীবনে যার উপাসনা করতে হবে। ঐ ইসলামে নবীর সুন্নাহ ছিল জীবন-সম্পদ দিয়ে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করতে করতে নিঃস্ব হয়ে যাওয়া, আর আজকের ইসলামে নবীর সুন্নাহ হচ্ছে মিসওয়াক করা, ডান কাতে শোয়া, খাওয়ার পরে মিষ্টি খাওয়া ইত্যাদি। ঐ ইসলামের নারীরা পরিবার, সমাজ থেকে শুরু করে বাজার ব্যবস্থাপনা, চিকিৎসাসহ রাষ্ট্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে অংশগ্রহণ করত, এমনকি পুরুষের সাথে যুদ্ধেও বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত আর আজকের ইসলামে নারীরা কেবল ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দী থাকে, যদি কখনো ব্যক্তিগত কাজে বাইরে বের হয় তবে আপাদমস্তক কালো কাপড়ে আবৃত করে তবে বের হয়। ঐ ইসলামে অনৈক্য সৃষ্টি করা ছিল কুফর, আজকের ইসলামে অনৈক্যকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়েছে। বিশ্বনবীর ঐ ইসলাম পৃথিবীর যেখানেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানেই ন্যায়, শান্তি

ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আর ব্রিটিশ ইসলামের মুসলিমরা সারা পৃথিবীতে অন্যান্য জাতিগুলোর চাইতে বেশি ফাসাদ ও সাফাকুদ্দিমার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। তাহলে এই ইসলাম কি বিশ্বনবীর আনিত প্রকৃত ইসলাম? আমরা কি আল্লাহর দৃষ্টিতে মু'মিন, মুসলিম, উম্মতে মোহাম্মদী রয়েছি? আমি জানি আমাদের এই বক্তব্য অনেকের পছন্দ হবে না। অনেকে অজুহাত খুঁজবেন। যুক্তি দিবেন- তাহলে এই যে কোটি কোটি মানুষ প্রতিদিন মসজিদে যাচ্ছে, পতাঁরচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ছে, বিরাট বিরাট আলিশান মসজিদ বানাচ্ছে, কলেমার জিকির করে পাড়া কতাঁরপাচ্ছে, এর কোনো মূল্য নেই? তাদের প্রতি আমার প্রশ্ন হচ্ছে-

১. আল্লাহ বলেছেন তিনি মো'মেনদের ওয়ালি, অভিভাবক, রক্ষক (বাকারা ২৫৭)। আল্লাহ যে জাতির অভিভাবক সেই জাতি কি তিনশ' বছর ব্রিটিশের দাসত্ব করতে পারে? পৃথিবীর সর্বত্র তারা পরাজিত, অপমানিত, লাঞ্ছিত, নির্যাতিত হতে পারে? তাদের মেয়েরা লাখে লাখে ধর্ষিত হতে পারে? তাদের শিশুদের মৃতদেহ সাগরে ভাসতে পারে? এই জাতির পরাজয়, দাসত্ব ও লাঞ্ছনা কি এটাই প্রমাণ করে না যে, আল্লাহ আর তাদের অভিভাবক নেই, আল্লাহ তাদেরকে ত্যাগ করেছেন?

২. আল্লাহ ওয়াদা করেছেন- তোমরা যদি মো'মেন হও তবে পৃথিবীর কর্তৃত্ব তোমাদের হাতে থাকবে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে দিয়েছিলাম (সুরা নুর ৫৫)। এখন যে জাতির হাতে পৃথিবীর কর্তৃত্ব থাকা তো দূরের কথা, যাদের বিগত কয়েক শতাব্দীর ইতিহাস হচ্ছে পাশ্চাত্যের খৃষ্টান জাতিগুলোর হাতে পরাজিত ও নির্যাতিত হওয়ায় ইতিহাস, সেই জাতিকে মো'মেন বলার অর্থ কি এটাই দতাঁরড়ায় না যে, আল্লাহ ওয়াদা ভঙ্গ করছেন? (নাউজুবিল্লাহ)। আর যদি আপনি বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ কখনোই ওয়াদা ভঙ্গ করেন না, তাহলে এই সহজ সত্যটি স্বীকার করতেই হবে যে, এই জাতি আর মো'মেন নয়।

আল্লাহর রসুল একদিন বললেন- 'অচিরেই এমন সময় আসছে যখন অন্যান্য জাতিগুলো তোমাদের বিরুদ্ধে একে অপরকে ডাকবে যেমন করে খাবার সময় মানুষ একে অপরকে খেতে ডাকে। কেউ একজন প্রশ্ন করলেন- তখন কি আমরা সংখ্যায় এতই নগণ্য থাকব? তিনি বললেন- না। তখন তোমরা সংখ্যায় অগণিত হবে, কিন্তু হবে স্রোতে ভেসে যাওয়া আবর্জনার মতো (হাদীস-সাওবান (রা.) থেকে আবু দাউদ, মেশকাত)। হাদীসটি খেয়াল করুন। আল্লাহর রসুল যাদেরকে স্রোতে ভেসে যাওয়া আবর্জনা বললেন তারা কি মো'মেন, মুসলিম, উম্মতে মোহাম্মদী হতে পারে? না, তারা এর কিছুই নয়। কারণ, আল্লাহর রসুল যে জাতিটি গঠন করেছিলেন সমস্ত পৃথিবীতে সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সেই জাতি কোনো স্রোতে ভেসে যাওয়া আবর্জনা ছিল না। ঐ জাতি ছিল সারা পৃথিবীর মুক্তির দূত, সারা পৃথিবীর মানুষের মুক্তির ঝাণ্ডা শোভা পেত ঐ জাতির হাতে। অন্যদিকে আল্লাহর রসুল যে জাতির কথা বলছেন তাদের দিয়ে সমস্ত মানবজাতির মুক্তি তো দূরের কথা, নিজেদের আত্মরক্ষাও সম্ভব নয়। এরা নিজেরা নিজেদের মধ্যে হানাহানি করবে, না খেয়ে থাকবে, সমুদ্রে ডুবে মরবে, উদ্বাস্তু হবে। বর্তমান অবস্থাই তার প্রমাণ।

এখানে পাঠকদের সম্ভাব্য ভুল ধারণা নিরসনে বলে রাখি- এই লেখাটিতে আমার সব কথাই কিন্তু জাতিকে নিয়ে, জাতিগত প্রশ্নে। ব্যক্তিগতভাবে কোথাও এমন মানুষ থাকতে পারেন যাদের আকীদা ঠিক আছে, ঈমান ঠিক আছে এবং তারা স্বল্প পরিসরে হলেও আল্লাহর রসুলের অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে সংগ্রাম করে যাচ্ছেন। বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্তভাবে মুসলিম জাতিতে এই শ্রেণিটির অস্তিত্ব আমরা ইতিহাসে পাই, এবং এই শ্রেণিটির অস্তিত্ব যে সব সময়ই থাকবে সেদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহর রসুল বলেছিলেন- 'আমার উম্মাহর একটি দল সবসময়ই হক্বের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।' কিন্তু ইসলামের প্রকৃত আকীদা জানা এই শ্রেণিটির অস্তিত্ব বর্তমানে যদি থাকেও, তার সংখ্যাটা হয়ত উল্লেখযোগ্য নয়। তাছাড়া ব্যক্তি সর্বদাই গৌণ বিষয়, মুখ্য হলো জাতি। আমাদের আলোচনা কেবল জাতির উত্থান-পতন নিয়ে।

আজ সারা পৃথিবীতে মুসলিম নামক জাতিটির অবস্থা কী? তাদেরকে যে যেভাবে পারছে আক্রমণ করছে, দেশগুলো দখল করছে, লুট করছে, লাখে লাখে হত্যা করছে, নারীদেরকে ধর্ষণ করছে, পৈত্রিক ভিটেবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করছে। পৃথিবীময় এই জাতি আজ সবচেয়ে নির্যাতিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত, অবহেলিত, পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে হাদীসে বর্ণিত স্রোতে ভেসে যাওয়া আবর্জনার মতোই। অথচ এই জাতিরই কিনা পৃথিবীকে নেতৃত্ব দেওয়ার কথা, পৃথিবীবাসীকে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করার কথা, সমস্ত পৃথিবীতে ন্যায়, শান্তি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে ইবলিশের চ্যালেঞ্জে আল্লাহকে বিজয়ী করার কথা, পৃথিবীর জীবনকে সুন্দর করার মধ্য দিয়ে পরকালকে সুন্দরময় করার কথা।

এমতাবস্থায় যুগের এই সন্ধিক্ষণে দতাঁরড়িয়ে জাতির পতনের কারণ অনুসন্ধান না করে, ইতিহাসের কোন জায়গাটিতে আমরা পথ হারিয়েছি, কেন আল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য করছেন না, কেন আমরা অন্যান্য জাতিগুলোর গোলামীতে নিমজ্জিত হয়ে আছি- ইত্যাদির কারণ অনুসন্ধান না করে আমরা যারা এখনও নিজেদের মুসলিম পরিচয় নিয়ে আত্মতুষ্টিতে ভুগছি, এমনকি নির্বোধের ন্যায় করে নিজেদেরকে একেবারে শ্রেষ্ঠ জাতি বলে দাবি করছি, তার বাস্তব সত্যতা কতটুকু তা পুনর্বিবেচনা করার সময় এসেছে।

লেখক: মাননীয় এমাম, হেযবুত তওহীদ

ট্রাম্প কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন বিশ্বকে?

মোহাম্মদ আসাদ আলী

ভোটের মৌসুম এলে ভোটারদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য প্রার্থীরা নানা ধরনের মনোরঞ্জক কথাবার্তা বলে বেড়ান। পণ্যের বিক্রি বাড়ানোর জন্য যেভাবে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, প্রার্থীরা নিজেদের পক্ষে ভোট টানার জন্য নিজেদের নিয়ে প্রকারান্তরে ঐরকম বিজ্ঞাপনী প্রচারণা শুরু করেন। অবশ্য এটাকে তারা বিজ্ঞাপনী প্রচারণা না বলে 'নির্বাচনী প্রচারণা' বলেন। বিজয়ী হলে কোন প্রার্থী কী কী করবেন তা সভা-সমাবেশ ইত্যাদি করে জানিয়ে দেওয়া হয়। আহা! সেই ইশতেহারগুলো শুনতে কার না ভালো লাগে! দেশে কোনো চুরি-ডাকাতি থাকবে না, খুন-রাহাজানি থাকবে না, সন্ত্রাস-চাঁদাবাজি থাকবে না, ক্ষুধা-দারিদ্র্যতা থাকবে না, দুর্নীতির দিন শেষ হবে, সর্বত্র কেবল শান্তির সাদা পায়রা উড়ে বেড়াবে! কিন্তু সত্য কথা হলো, এই সুন্দর সুন্দর বাণীগুলো শেষ পর্যন্ত আলোর মুখ দেখে না বললেই চলে। ক্ষমতার পালা বদলায়, শাসক বদলায়, কেবল শাসিতের ভাগ্য বদলায় না। নির্বাচন শেষ হলে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির কথাও ভুলে যান শাসকরা। আবার অনেকে পরিবর্তনের মানসিকতা নিয়ে ক্ষমতায় বসেন ঠিকই, কিন্তু সিস্টেমের বেড়াজালে আষ্টেপৃষ্ঠে আটকে পড়ে থাকেন, কিছুই করতে পারেন না। এই চিত্র আমরা সারা পৃথিবীতেই দেখে আসছি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও তার বাইরে নয়। তবে ২০১৬'র শেষ প্রান্তে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিজয়ী প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প- এর বেলায় বোধহয় এই হিসাব-নিকাশ টিকছে না। পরিবর্তনের যে আভাস তিনি নির্বাচনী প্রচারণায় দিয়েছিলেন, সেগুলো যে নিছক 'নির্বাচনী বৈতরণী' পার হবার জন্য নয়, সত্যিই সেই পরিবর্তনগুলো তিনি ঘটাতে চান ও ঘটাতে সক্ষমও, সেই বার্তা ইতোমধ্যেই বিশ্ববাসী পেতে শুরু করেছে। এখন ভেবে দেখার বিষয় হচ্ছে- এই পরিবর্তনগুলো কতটুকু ইতিবাচক!

যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এরকম ঘটনা ঘটেনি যে, একজন নবনিযুক্ত রাষ্ট্রনায়ককে ফুলেল শুভেচ্ছা দিয়ে বরণ করে নেওয়ার বদলে লক্ষ লক্ষ মানুষ রাস্তায় নেমে সহিংস বিক্ষোভ করেছে, পুলিশের সাথে সংঘর্ষ করেছে, জ্বালাও-পোড়াও করেছে। কিন্তু ট্রাম্পের বেলায় তেমনটাই ঘটল। কেবল যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতেই নয়, ইউরোপের দেশগুলোতেও হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে নিজেদের অবস্থান জানান দেয়। মিডিয়ার আক্রমণও ভালোই ধরাশায়ী

করছে ট্রাম্পকে। তিনি ধরেই নিয়েছেন মিডিয়া তার শত্রু। সাংবাদিকদেরকে 'দুনিয়ার সবচেয়ে অসৎ মানুষ' আখ্যা দিয়ে যথারীতি সাংবাদিকদের সাথে 'যুদ্ধের ঘোষণা' দেন তিনি। এসব ঘটনা আর যাই হোক ইতিবাচক কিছু নয়।

পৃথিবী আজ ক্ষমতার কাছে অসহায়। গুটিকতক পরাশক্তিধর রাষ্ট্রের হাতে জিম্মি হয়ে আছে পৃথিবীর ৭০০ কোটি মানুষ। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই পরাশক্তিধর রাষ্ট্রগুলোরই অন্যতম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এই পরমাণু অস্ত্রসমৃদ্ধ রাষ্ট্রটি বিশ্বের দেশে দেশে দাদাগিরি করে আসছে। দেশে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে, শান্তি স্থাপনার নামে, সন্ত্রাস দমনের নামে অসংখ্য ছোট-বড় যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করার কলঙ্কজনক ইতিহাস আছে এই দেশটির। 'স্নায়ুযুদ্ধ' থেকে শুরু করে ফিলিস্তিনে ইজরায়েলি আগ্রাসন, জঙ্গিবাদের উত্থান, কিংবা আজকের সিরিয়া সঙ্কট, কোথায় নেই যুক্তরাষ্ট্র? সুতরাং এই দেশটিতে বড় ধরনের রাজনৈতিক পরিবর্তন আসলে, দেশটির পররাষ্ট্রনীতিতে বড় ধরনের পট পরিবর্তন ঘটলে, তা কেবল যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, তার রেশ ছড়িয়ে পড়বে সারা বিশ্বে- তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এমনিতেই পৃথিবীর ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বড়ই সঙ্গীন। দেশে দেশে চলছে অস্থিরতা, জনগণের মধ্যে দানা বাঁধছে অসন্তোষ, বেড়েছে ঘৃণা ও বিদ্বেষের চর্চা, গণতন্ত্রের পাতলা পর্দা ভেদ করে বেরিয়ে আসছে একবিংশ শতাব্দীর হিটলার-মুসোলিনিরা, যুদ্ধ বন্ধ নেই একটি দিনের জন্যও, সীমান্তে সীমান্তে বিরাজ করছে উত্তেজনা, এক রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রের দিকে তাক করে রেখেছে আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র, ১৬ হাজার তরতাজা পরমাণু বোমা মজুদ হয়ে আছে রাষ্ট্রগুলোর হাতে। কেউ বলছেন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেঁধে গেলে পৃথিবী থাকবে না। কেউ বলছেন ইতোমধ্যেই যুদ্ধ বেঁধে গেছে। এমন একটি সঙ্কটজনক অবস্থায় বিশ্বের অপ্রতিরোধ্য একটি পরাশক্তিধর রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হয়েছেন এমন একজন ব্যক্তি যার প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি চিন্তা-ভাবনা, প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত চরম উগ্রতায় পরিপূর্ণ, বিতর্কিত ও বিদ্বেষ সৃষ্টিকারী। এবং তার এই কথাগুলো যে 'কথার কথা' নয়, সেটাও দিনদিন স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তাই সর্বমহলে প্রশ্ন উঠছে, একবিংশ শতাব্দীর এই যুগসন্ধিক্ষণে ট্রাম্প কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন বিশ্বকে?

পৃথিবী আজ ক্ষমতার কাছে অসহায়। গুটিকতক পরাশক্তিধর রাষ্ট্রের হাতে জিম্মি হয়ে আছে পৃথিবীর ৭০০ কোটি মানুষ। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই পরাশক্তিধর রাষ্ট্রগুলোরই অন্যতম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এই পরমাণু অস্ত্রসমৃদ্ধ রাষ্ট্রটি বিশ্বের দেশে দেশে দাদাগিরি করে আসছে। দেশে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে, শান্তি স্থাপনার নামে, সন্ত্রাস দমনের নামে অসংখ্য ছোট-বড় যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করার কলঙ্কজনক ইতিহাস আছে এই দেশটির। 'স্নায়ুযুদ্ধ' থেকে শুরু করে ফিলিস্তিনে ইজরায়েলী আগ্রাসন, জঙ্গিবাদের উত্থান, কিংবা আজকের সিরিয়া সঙ্কট, কোথায় নেই যুক্তরাষ্ট্র?

ট্রাম্প যে প্রতিশ্রুতিগুলো দিয়েছিলেন তার প্রায় সবই কিন্তু তিনি অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করতে চলেছেন। কয়েকটি বিষয়ে সিস্টেমের চাপে পড়ে সামান্য শৈথিল্য প্রদর্শন করলেও ইতোমধ্যেই নির্বাহী আদেশ জারি করে একের পর এক প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের কাজে লেগে পড়েছেন তিনি। উগ্র জাতীয়তাবাদকে তিনি পুঁজি করেছেন। স্লোগান দেওয়া হচ্ছে যে, 'আমেরিকা ফার্স্ট'। কেমন হবে ট্রাম্পের সেই 'ফার্স্ট আমেরিকা'? এখন পর্যন্ত যতটা বোঝা যাচ্ছে সে মোতাবেক বলা যায়- ট্রাম্পের ঐ আমেরিকায় কোনো অভিবাসী বা শরণার্থী থাকবে না। কোনো মুসলমান থাকবে না। শ্বেতাঙ্গরা তাদের প্রভুত্বের আসনে ফিরে যাবে, কৃষ্ণাঙ্গরা গোলামী করবে। অর্থনীতিতে আমেরিকা হবে প্রথম, সামরিক শক্তিতে আমেরিকা হবে প্রথম। এক কথায় আমেরিকা থাকবে সবার উপরে, অর্থাৎ সেই উগ্র জাতীয়তাবাদ, সেই ভৌগোলিক বিভাজনের ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠত্ব-নিকৃষ্টত্বের মাপামাপি। হিটলার-মুসোলিনির উগ্র জাতীয়তাবাদ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ডেকে এনেছিল। ট্রাম্পের এই জাতীয়তাবাদ কি তবে বিশ্বকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে নিয়ে যাচ্ছে? ইতোমধ্যেই সামরিক বাজেট বাড়ানোর কথা বলছেন ট্রাম্প, যদিও বিশ্বের অন্য যে কোনো দেশের চাইতে সামরিক খাতে অনেক বেশি ব্যয় করে যুক্তরাষ্ট্র। বছরে প্রায় ৬০ হাজার কোটি ডলার। পৃথিবীময় ছড়িয়ে আছে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটি, সমুদ্রে ভাসছে নৌবহর। তা সত্ত্বেও আরও ১০ শতাংশ বাজেট বৃদ্ধির কারণ হিসেবে ট্রাম্প বলেছেন, এর মাধ্যমে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি ও জাতীয় নিরাপত্তার ব্যাপারে বিশ্বকে একটি বার্তা দিতে চান। বোঝাই যায় এই বার্তা আর যাই হোক শান্তির নয়, মানবতার নয়; এই বার্তা হিংসার, আগ্রাসনের, মাইট ইজ রাইটের, স্বেচ্ছাচারিতার, যুদ্ধ-রক্তপাতের। এমনিতেই যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসী নীতির খেসারত দিতে হচ্ছে বিশ্বকে। সারা মধ্যপ্রাচ্যে আগুন জ্বলছে। সেই আগুনের আঁচ থেকে মুক্ত নয় ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকাও। এই সঙ্কটের পেছনে যুক্তরাষ্ট্রের দায় কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। সিরিয়া ইস্যুতে বরাবরই আমেরিকা-রাশিয়া মুখোমুখী বন্দুক তাক

করে দাঁড়িয়ে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য একটি পক্ষের হঠকারিতাই যথেষ্ট নয় কি?

ট্রাম্প ক্ষমতায় এসে প্রথম সাত দিনেই যে কয়টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে হাত দিয়েছিলেন তার মধ্যে একটি হচ্ছে- পার্শবর্তী রাষ্ট্র মেক্সিকোর সীমান্তে দেয়াল তোলা। সেই দেওয়ালের খরচ আবার দাবি করছেন মেক্সিকোর কাছেই। টিপিপি বাণিজ্য চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহার করার ঘটনাও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। এর কিছুদিন পর নির্বাহী ক্ষমতার বলে মধ্যপ্রাচ্যের সাতটি দেশ থেকে আমেরিকায় মুসলিমদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে ফেলেন তিনি। এ নিয়ে সারা বিশ্বে তোলপাড় শুরু হয়। এই স্বৈরাচারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দেশে-বিদেশে শুরু হয় ব্যাপক আন্দোলন, বিক্ষোভ। অবশেষে আদালত ট্রাম্পের এই নির্দেশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে তাতে স্থগিতাদেশ দিলে ট্রাম্পের রোষানলে পড়েন দেশটির ভারপ্রাপ্ত এটর্নি জেনারেল। তাকে বহিষ্কার করেন ট্রাম্প।

যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের শিকার হয়ে পৃথিবীর মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্বভাবতই একটি পশ্চিমাবিদ্বেষী মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে। এর জন্য যুক্তরাষ্ট্রই অনেকাংশে দায়ী। যুক্তরাষ্ট্রের আফগানিস্তান দখল, ইরাক দখল, লিবিয়ায় সামরিক হামলা, সিরিয়ায় বিদ্রোহী জঙ্গিগোষ্ঠীগুলোকে সামরিক সহায়তা প্রদান, আফগানিস্তান-পাকিস্তানে ড্রোন হামলা করে নিরীহ বেসামরিক মানুষ হত্যা ইত্যাদি পদক্ষেপগুলো মুসলিমদের স্বার্থে সরাসরি আঘাত করে। এক ইরাক যুদ্ধেই দশ লক্ষ মুসলমান প্রাণ হারায়। লাখ লাখ মুসলিম নারী ধর্ষিত হয়। অথচ যে অজুহাতে যুদ্ধ চাপানো হলো, সেই রাসায়নিক অস্ত্র থাকার খবর পুরোটাই ভুয়া ছিল- তা এখন স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। ফিলিস্তিনে সেই পঞ্চাশের দশক থেকে ইজরাইল নামক অবৈধ রাষ্ট্রটি সেখানকার মুসলিম অধিবাসীদের উপর কী নির্মম অত্যাচার-নিপীড়নই না করে আসছে। ছোট ছোট শিশুদের টার্গেট করে পাখির মতো গুলি করে মারা হয়েছে। আর তার পেছনে একচ্ছত্র সমর্থন যুগিয়ে এসেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সিরিয়ার বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোকে অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিয়ে আসাদ সরকারের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র ও তার আরবীয় মিত্ররা। সেই পশ্চিমা অস্ত্র, প্রশিক্ষণ ও আরবীয় অর্থের যোগান পেয়েই পরিপুষ্ট হয়েছিল আজকের আইএস জঙ্গিরা। এখন আবার সেই আইএসকে হঠাতে গিয়ে আকাশ থেকে বোমা ফেলে লাখ লাখ নিরীহ মুসলমানকে হত্যা করা হচ্ছে। উদ্বাস্তু হচ্ছে কোটি কোটি মুসলমান। মুসলিম দেশগুলোতে একের পর এক চাপিয়ে দেওয়া পশ্চিমাদের এই সংঘাতগুলোকে তাই বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে এটাকে 'ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশন' এরই সত্যতার প্রমাণ হিসেবে দেখছেন অনেকে। এরকম পরিস্থিতিতে ট্রাম্পের একের পর এক মুসলিমবিদ্বেষী বক্তব্য ও মুসলিমদের আমেরিকায় প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা আরোপের চেষ্টা পশ্চিমাদের সাথে মুসলিমদের দূরত্বকেই আরও বাড়িয়ে তুলবে তাতে সন্দেহ নেই। বাড়বে বিদ্বেষ। বাড়বে অবিশ্বাস। আর তার সুযোগ নিয়ে জঙ্গি-সন্ত্রাসীরা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলবে। মুসলিমদের রক্ত ঝরানোর জন্য সিরিয়া-ইরাকের মতো নতুন নতুন যুদ্ধক্ষেত্র গড়ে তুলবে। অবশ্য ডোনাল্ড ট্রাম্প যদি তেমন কিছুই আশা করেন তবে অবাক হবার কিছু নেই। এটা তো জানা কথা যে, যত যুদ্ধ হবে, যত নতুন নতুন যুদ্ধক্ষেত্র তৈরি হবে, ওয়ার ইকোনমির আমেরিকা ততই লাভবান হবে।

বারাক ওমাবার মেয়াদ শেষ পর্যায়ে উপনীত হলে হঠাৎ ইজরাইল-ফিলিস্তিন সঙ্কট নিয়ে নড়েচড়ে উঠেন তিনি। পুরো শাসনামল ইজরায়েলকে একচ্ছত্র সমর্থন যোগালেও, শেষ মুহূর্তে এসে কেন তিনি হঠাৎ ফিলিস্তিনিদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠেছিলেন, কেন তার প্রশাসন ইজরায়েলের অবৈধ কর্মকাণ্ডের সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছিল তা এক বিরাট প্রশ্ন হয়ে আছে। তবে ট্রাম্প ক্ষমতায় এসে বারাক ওবামার ঐ নীতি আমূল পাল্টে ফেলবেন তার ঘোষণা আগেই দিয়ে রেখেছিলেন তিনি। করেছেনও তাই। ইতোমধ্যেই ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে অভয় প্রদান করেছেন তিনি। পশ্চিম তীরে বসতি নির্মাণের ব্যাপারে আকারে-ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র ইজরায়েলের পাশেই থাকবে। 'কট্টর ইজরায়েলপন্থী' হিসেবে পরিচিত ডেভিড ফ্রাইডম্যানকে ইজরায়েলের রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন ট্রাম্প। উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে মার্কিন দূতাবাস তেল আবিব থেকে সরিয়ে জেরুজালেমে স্থানান্তরিত করার। সুতরাং ইজরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাত যে নিকট ভবিষ্যতে সমাধানের মুখ দেখছে না তা এক প্রকার নিশ্চয়তা দিয়েই বলা যায়। সেই সাথে এও বলা যায়, ফিলিস্তিন সঙ্কট যতদিন জিঁইয়ে রাখা হবে ততদিন মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি স্থায়িত্ব লাভ করবে না।

এইভাবে খেয়াল করলে দেখা যাচ্ছে ট্রাম্পের আমেরিকা কেবল আমেরিকাকেই অনিশ্চয়তার দিকে নিয়ে যাচ্ছে না, সারা বিশ্বকেই এক গভীর সঙ্কটের মুখোমুখী এনে দাঁড় করাচ্ছে। এই সঙ্কটের পরিণতি শেষাবধি 'তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ' পর্যন্ত গড়ায় কিনা সেটাই এখন দেখার বিষয়।

এখন আমাদের করণীয় কী?

সাতচল্লিশের পূর্বে ট্রাম্পের পূর্বপুরুষরা ছিল আমাদের প্রভু। অন্তত দুইশ' বছর ধরে তাদের শাসন ও শোষণে নিঃস্ব হয়েছি আমরা। আমাদের রক্ত পানি করে ফলানো ফসল তারা জাহাজ বোঝাই করে নিজেদের দেশে নিয়ে গেছে, আর আমাদের প্রতি তিনজনে একজন মারা গেছে খাবারের অভাবে। যখন

রুখে দাঁড়িয়েছি; তিতুমীর, মজনু শাহ, শরীয়তুল্লাহ, ভগত সিং, প্রীতিলতা, সুভাসচন্দ্র, সূর্যসেনরা অত্যাচারী অপশক্তির টুঁটি চেপে ধরতে উদ্যত হয়েছে, তখন তারা আমাদের মধ্যে বপন করে দিল ধর্মীয় বিভক্তির বীজ। আমরা নিজেরাই নিজেদের শত্রু হয়ে গেলাম, আর তারা নিশ্চিন্তে আমাদের শোষণ করতে লাগল। অবশেষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ করে দুর্বল হয়ে পড়লে নিজেদের দুর্বলতাকে 'উদারতা'র মোড়কে ঢেকে রেখে আমাদেরকে আপাত স্বাধীনতা দিয়ে চলে গেল। আমাদের ধর্মীয় বিভক্তি ভৌগোলিক বিভক্তির পরিণতিতে গড়াল।

আমাদেরকে বলা হলো ইসলামের আদর্শের কথা। কিন্তু বাস্তবে ইসলামের সেই আদর্শ, সেই ঐক্য, সেই ভ্রাতৃত্বের কিছুই আমরা পাই নি। পাকিস্তানি আমলের ২৩টি বছরে আমরা পেয়েছি কেবল বঞ্চনা, জুলুম, নির্যাতন আর শোষণ। তার পরিণতিতে আমরা রক্ত দিয়ে একাত্তরে দেশ স্বাধীন করলাম। কিন্তু তবু যেন অপূর্ণতা থেকেই গেল। গত ৪৫টি বছর আমরা কেবলই নিজেরা নিজেরা দাঙ্গা-হাঙ্গামা, মারামারি করে কাটালাম। রাজনীতির নামে হানাহানি, ধর্মের নামে বিভাজন আর প্রতারণা আমাদেরকে স্বাধীনতার সুফল ভোগ করতে দেয় নি। আমরা নিজেরা নিজেরা স্বার্থের মোহে মারামারি করেছি, ক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়ি করেছি, আর নির্লজ্জের মতো ঐ প্রভুদেরকে ডেকেছি আমাদের বাদ-বিবাদের মীমাংসা করে দেওয়ার জন্য, আমাদের উপর মোড়লিপনা করার জন্য। অথচ আমরা চোখের সামনে সিরিয়া ধ্বংস হতে দেখলাম, লিবিয়া ধ্বংস হতে দেখলাম, পাকিস্তানের মতো একটি শক্তিশালী দেশকে কার্যত ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত হতে দেখলাম শুধুই ঐসব পরাশক্তিদের ডেনে আনার কারণে। এখনও যদি আমরা না বুঝি, সতর্ক না হই, ঐ পরাশক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর চাকচিক্যময় লেবাসের ভেতরের কুৎসিত দানবটাকে দেখতে না পাই তাহলে বৈশ্বিক যে সঙ্কটের আশঙ্কা করা হচ্ছে, আমরা তা থেকে নিস্তার পাব না। এখন আমাদেরকে অত্যন্ত সতর্কভাবে পদক্ষেপ নিতে হবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে শক্তিশালী একটা জাতিসত্তা গড়ে তুলতে হবে। ধর্মের নামে বা রাজনীতির নামে বিভাজন হতে দেওয়া যাবে না। ভাগ্যের হাতে সব ছেড়ে দিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকাও চলবে না। সমস্যা অনুধাবন করতে হবে এবং সঙ্কট এলে কীভাবে সমাধান করা যাবে তার উপায় নিয়ে ভাবতে হবে।

লেখক: সহকারী সাহিত্য সম্পাদক, দৈনিক বজ্রশক্তি

সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্র এবং অভ্যন্তরীণ সংকট থেকে প্রিয় জন্মভূমিকে নিরাপদ রাখা কি সম্ভব?

হ্যাঁ সম্ভব?
একটা নির্ভুল আদর্শের ভিত্তিতে ঈমানী চেতনা ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে ঐক্যবদ্ধ হলেই সেটা সম্ভব।

হেযবুত তওহীদ
মানবতার কল্যাণে নিবেদিত

দোয়া ব্যর্থ হয় কেন?

রাকিব আল হাসান

অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার থেকে মানুষকে মুক্ত করার লক্ষ্যে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্যই এই উম্মতে মোহাম্মদী নাম জাতিটিকে আল্লাহর শেষ রসুল সৃষ্টি করেছিলেন। নবী হওয়ার পর থেকে শুরু করে এই সংগ্রাম তিনি পার্থিব জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত করে গেছেন। এই সংগ্রাম করে সারা পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁর পৃথিবীতে আবির্ভাবের উদ্দেশ্য। তাই এই সংগ্রামই হচ্ছে তাঁর সুন্নাহ। সুন্নাহ শব্দের অর্থ রীতি-নীতি, কর্মপদ্ধতি। পবিত্র কোর'আনে আল্লাহ নিজের কর্মপদ্ধতির বেলাতেও সুন্নাতাল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর সুন্নত (The practice of Allah) শব্দটি ব্যবহার করেছেন (সুরা ফাতাহ ২৩)। রসুলাল্লাহর কর্মপদ্ধতি বা সুন্নাহ যারা অনুসরণ করবে তারাই হবে উম্মতে মোহাম্মদী। কিন্তু যারা সেই কাজ ত্যাগ করবে তারা কখনোই উম্মতে মোহাম্মদী হতে পারে না। কিন্তু ঐতিহাসিক সত্য হলো, মহানবীর পর তাঁর অনুসারীরা ৬০/৭০ বছর পর্যন্ত ঐ সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিল। তারপর তা বন্ধ করা হয় এবং উমাইয়া বংশীয় খলিফারা নামে খলিফা থেকেও বিপুল সম্পদ ও ক্ষমতার মালিক হয়ে পৃথিবীর আর দশটা রাজা-বাদশাহর মত শান-শওকতের সঙ্গে রাজত্ব করা আরম্ভ করেন। সেই সময় থেকে জাতির নেতৃত্ব, আলেম সমাজ এবং সেই সঙ্গে জাতিও উম্মতে মোহাম্মদী থেকে বহিষ্কৃত হয়ে যায়। এই শেষ দীনকে সমস্ত পৃথিবীতে প্রয়োগ ও কার্যকরী করে, মানুষে মানুষে সমস্ত বিভেদ মিটিয়ে দিয়ে, মানবজাতিকে একটি মাত্র মহাজাতিতে পরিণত করে, সমস্ত যুদ্ধ-রক্তপাত বন্ধ করে, সমস্ত অন্যায়-অবিচার নির্মূল করে শান্তি (ইসলাম) প্রতিষ্ঠা করার আপসহীন সংগ্রাম ত্যাগ করার অর্থাৎ জাতির লক্ষ্যবিচ্যুত হওয়ার যে সব ফল হলো তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলোঃ-

(ক) মূল কাজ অর্থাৎ সংগ্রাম ছেড়ে দেওয়ায় দুর্দান্ত গতিশীল জাতির কর্মপ্রবাহ ভিন্ন দিকে মোড় নিল। আল্লাহ ও রসুল যে কাজ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন সেই কাজ, কোর'আন-হাদিসের অতি বিশ্লেষণ অর্থাৎ দীন নিয়ে বাড়াবাড়ি জোরে-শোরে ধুমধামের সাথে আরম্ভ করা হলো। জাতির

মধ্যে জন্ম নিল মহা মহা আলেম, ফকীহ, মোফাসসের, মোহাদ্দেস প্রভৃতি। তাদের আবিষ্কৃত মাসলা-মাসায়েলের জটিলতায় পড়ে লক্ষ্যচ্যুত জাতি বহু মাযহাবে ও ফেরকায় বিভক্ত হয়ে শুধু শক্তিহীন হয়েই পড়ল না, বিভিন্ন মাযহাব ও ফেরকার মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে নির্জীব হয়ে গেল।

(খ) পূর্ববর্তী ধর্মগুলোর বিশেষ করে পারস্যের বিকৃত ভারসাম্যহীন সুফীবাদ অর্থাৎ পীর-মুরিদি এই জাতির মধ্যেও প্রবেশ করল। বহুপ্রকার মাজহাব ফেরকায় খণ্ড-বিখণ্ড ও নির্জীব এই জাতির মধ্যে প্রবেশ করে এর বহির্মুখী দৃষ্টি ও চরিত্রকে উল্টো করে অন্তর্মুখী করে দিল। অর্থাৎ যে জাতির জেহাদ ছিল শত্রুর বিরুদ্ধে, সেই জাতি আত্মার বিরুদ্ধে জেহাদে অর্থাৎ খানকা, মাজারের চার দেওয়ালের মধ্যে ধ্যানে বুঁদ হয়ে গেল। আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা অনুসরণ করার ফলে এই জাতি ইতোমধ্যেই পৃথিবীর সমস্ত অন্যায়কারী- সমস্ত নির্যাতনকারী- সমস্ত অবিচারক ও অত্যাচারী ব্যবস্থার ত্রাসে পরিণত হয়েছিল, তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানে পৃথিবীর শিক্ষক হয়ে নতুন নতুন জ্ঞানের দুয়ার পৃথিবীর মানুষের জন্য খুলে দিয়েছিল, নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে মানব সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করেছিল। কিন্তু আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জনের আশায় বিকৃত আধ্যাত্মিক তরিকার অনুগামী হওয়ার ফলে এ জাতি অন্তর্মুখী হয়ে একটা সময়ে অশিক্ষিত অজ্ঞ, প্রায় পশু পর্যায়ের জনসংখ্যায় পর্যবসিত হয়ে গেল। অথচ সুফিদের প্রদর্শিত আত্মিক পরিশুদ্ধি লাভের এই বিকৃত তরিকাগুলোর দ্বারা আল্লাহর সান্নিধ্য পাওয়া কোনোদিনই সম্ভব নয়, বিশেষ করে উম্মতে মোহাম্মদী জাতির জন্য তো নয়-ই। কারণ যে জাতি সমস্ত মানবজাতির দুঃখ-দুর্দশা দূর করার প্রত্যয় নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে, যারা রসুলাল্লাহর প্রদর্শিত পথে যাবতীয় অন্যায়, অসত্য আর অধর্মের বিরুদ্ধে সংঘাত করেছিল, সেই জাতিটিই যখন স্বার্থপরের মতো নিজের আত্মার ঘষামাজা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল তখন তারা আর রসুলাল্লাহর অনুসারী অর্থাৎ উম্মতে মোহাম্মদীই রইল না। একদিন যারা এ জাতির দিকে চোখ তুলে তাকানোর সাহস করত না, সেই ইউরোপীয় জাতিগুলো যখন দেখল যে, অর্ধ-বিশ্বজয়ী মুসলিম জাতিটি এখন একটি ভেড়ার জাতিতে পরিণত হয়েছে, তখন তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত আক্রমণ চালাতে শুরু করল এবং পরিণামে এই মুসলিম জাতিটি ইউরোপের জাতিগুলোর গোলামে পরিণত হলো।

কয়েকশ' বছর ঘৃণ্য দাসত্বের পর কিছুদিন থেকে আপাতদৃষ্টিতে স্বাধীনতা পেলেও এই জনসংখ্যা প্রকৃতপক্ষে আজও আদর্শগত ও মানসিকভাবে পূর্বতন পাশ্চাত্য প্রভুদের গোলামই আছে, বোধহয় গোলামী যুগের চেয়েও বেশিভাবে আছে। তারা তাদের সব ক্ষমতা ও শক্তি হারিয়ে এখন নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য সৃষ্টিকর্তার কাছে দোয়া চাওয়াকেই একমাত্র উপায় বলে মনে করছে। তাই আজ এই শক্তিহীন অক্ষম ব্যর্থ জাতির একমাত্র কাজ হচ্ছে আল্লাহর কাছে দোয়া চাওয়া। এর ধর্মীয় নেতারা, আলেম, মাশায়েখরা এই দোয়া চাওয়াকে বর্তমানে একটি আর্টে, শিল্পে পরিণত করে ফেলেছেন। লম্বা সময় ধরে এরা লম্বা ফর্দ ধরে আল্লাহর কাছে দোওয়া করতে থাকেন, যেন এদের দোয়া মোতাবেক কাজ করার জন্য আল্লাহ অপেক্ষা করে বসে আছেন। মাঝে মাঝে বিশেষ (Special) দোয়া ও মোনাজাতের মাহফিলেরও ডাক দেওয়া হয়, মাইকে প্রচার-প্রচারণা চালানো হয় এবং তাতে এত লম্বা সময় ধরে মোনাজাত করা হয় যে হাত তুলে রাখতে রাখতে মানুষের হাত ব্যথা হয়ে যায়। এসব মাহফিলের উদ্দেশ্য থাকে সাধারণত কোনো নির্মাণাধীন মসজিদ বা মাদ্রাসার জন্য অর্থ সংগ্রহ করা যে অর্থের সিংহভাগই আলেম দাবিদার ধর্মব্যবসায়ীদের পকেটে যায়।

একবার লাউড স্পিকারে এক 'ধর্মীয় নেতার' বাদ ওয়াজ দোয়া শুনছিলাম। তিনি আল্লাহর কাছে লিস্ট মোতাবেক দফাওয়ারী (Item by item) বিষয় চাইতে লাগলেন। বেশির ভাগ বিষয়ই আধ্যাত্মিক অর্থাৎ চারিত্রিক উন্নতির ব্যাপারে, তবে ইহুদীদের

মাঝে মাঝে বিশেষ (Special) দোয়া ও মোনাজাতের মাহফিলেরও ডাক দেওয়া হয়, মাইকে প্রচার-প্রচারণা চালানো হয় এবং তাতে এত লম্বা সময় ধরে মোনাজাত করা হয় যে হাত তুলে রাখতে রাখতে মানুষের হাত ব্যথা হয়ে যায়। এসব মাহফিলের উদ্দেশ্য থাকে সাধারণত কোনো নির্মাণাধীন মসজিদ বা মাদ্রাসার জন্য অর্থ সংগ্রহ করা যে অর্থের সিংহভাগই আলেম দাবিদার ধর্মব্যবসায়ীদের পকেটে যায়।

দোয়াতেই যদি কাজ হতো তবে আল্লাহর কাছে যার দোয়ার চেয়ে গ্রহণযোগ্য আর কারো দোয়া হতে পারে না - সেই রসুল ঐ অক্লান্ত প্রচেষ্টা (জেহাদ) না করে শুধু দোয়াই করে গেলেন না কেন সারাজীবন ধরে? তিনি তা করেন নি, কারণ তিনি জানতেন যে প্রচেষ্টা (আমল জেহাদ) ছাড়া দোয়ার কোনো দাম আল্লাহর কাছে নেই। সেই সর্বশ্রেষ্ঠ নবী দোয়া যে করেন নি তা নয়; তিনি করেছেন, কিন্তু যথাসময়ে করেছেন অর্থাৎ চূড়ান্ত প্রচেষ্টার পর, সর্বরকম কোরবানির পর, জান বাজি রাখার পর যখন আমলের আর কিছু বাকি নেই তখন।

ইসরাইল রাষ্ট্রকে ধ্বংস করে পবিত্র মসজিদ বাইতুল মোকাদ্দাসকে মুসলিমদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার একটা দফা ছিল, এবং দুনিয়ার মুসলিমের ঐক্যও একটা দফা ছিল। ছত্রিশটা দফা গোনার পর আর গোনার ধৈর্য ছিল না। তবে এরপরও যতক্ষণ দোয়া চলেছিল, তাতে মনে হয় মোট কমপক্ষে শ'খানেক বিষয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া চাওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ আল্লাহ- ঐ শ'খানেক বিষয় তুমি আমাদের জন্য করে দাও। অজ্ঞানতা ও দোয়া সম্পর্কে ভুল ধারণা থাকার কারণে এরা ভুলে গেছেন যে কোনো জিনিসের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা না করে শুধু আল্লাহর কাছে চাইলেই তিনি তা দেন না, ওরকম দোয়া তাঁর কাছে পৌঁছে না। আল্লাহ তাঁর শ্রেষ্ঠ নবী, তাঁর প্রিয় হাবিবকে যে কাজের ভার দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন অর্থাৎ সত্যদীন প্রতিষ্ঠা, সে কাজ সম্পন্ন করতে তাকে কী অপরিসীম পরিশ্রম করতে হয়েছে, কত অপমান-বিদ্রূপ-নির্যাতন-পীড়ন সহ্য করতে হয়েছে- যুদ্ধ করতে হয়েছে- আহত হতে হয়েছে। শুধু দোয়া দিয়েই যদি কাজ উদ্ধার হতো, তাহলে তিনি ওসব না করে বসে বসে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেই তো পারতেন আমাদের ধর্মীয় নেতাদের মতো। আল্লাহর কাছে বিশ্বনবীর দোয়া বড়, না আমাদের আলেম মাশায়েখদের দোয়া বড়? দোয়াতেই যদি কাজ হতো তবে আল্লাহর কাছে যার দোয়ার চেয়ে গ্রহণযোগ্য আর কারো দোয়া হতে পারে না - সেই রসুল ঐ অক্লান্ত প্রচেষ্টা (জেহাদ) না করে শুধু দোয়াই করে গেলেন না কেন সারাজীবন ধরে? তিনি তা করেন নি, কারণ তিনি জানতেন যে প্রচেষ্টা (আমল জেহাদ) ছাড়া দোয়ার কোনো দাম আল্লাহর কাছে নেই। সেই সর্বশ্রেষ্ঠ নবী দোয়া যে করেন নি তা নয়; তিনি করেছেন, কিন্তু যথাসময়ে করেছেন অর্থাৎ চূড়ান্ত প্রচেষ্টার পর, সর্বরকম কোরবানির পর, জান বাজি রাখার পর যখন আমলের আর কিছু বাকি নেই তখন। বদরের যুদ্ধ শুরু হবার ঠিক আগের মুহূর্তে যখন মুজাহিদ আসহাবগণ তাদের প্রাণ আল্লাহর ও রসুলের জন্য কোরবানি করার জন্য তৈরি হয়ে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছেন, এখনই যুদ্ধ আরম্ভ হবে, শুধু সেই সময় আল্লাহর হাবিব আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন তাঁর প্রভুর সাহায্য চেয়ে। ঐ দোয়ার পেছনে কী ছিল? ঐ দোয়ার পেছনে ছিল আল্লাহর নবীর চৌদ্দ বছরের অক্লান্ত সাধনা, সীমাহীন কোরবানি, মাতৃভূমি ত্যাগ করে দেশত্যাগী হয়ে যাওয়া, পবিত্র দেহের রক্তপাত ও আরও বহু কিছু। এবং এসব কোরবানি শুধু তাঁর একার নয়। ঐ যে তিনশ' তের জন ওখানে তাঁদের প্রাণ উৎসর্গ করার জন্য সালাতের (নামাজ) মতো সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো ছিলেন তাঁদেরও প্রত্যেকের পেছনে ছিল তাঁদের আদর্শকে, দীনকে প্রতিষ্ঠার জন্য অক্লান্ত প্রচেষ্টা, দ্বিধাহীন কোরবানি, নির্মম নির্যাতন সহ্য করা। প্রচেষ্টার শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে শেষ সম্বল প্রাণটুকু দেবার জন্য তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে ঐ দোয়া করেছিলেন মহানবী (স.)। ঐ রকম দোয়াই আল্লাহ শোনেন, কবুল করেন, যেমন করেছিলেন বদরে। কিন্তু প্রচেষ্টা নেই, বিন্দুমাত্র সংগ্রাম নেই, ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাত তুলে দোয়া আছে অমন দোয়া আল্লাহ কবুল করেন না। বদরের ঐ দোয়ার পর সকলে জেহাদে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, অনেকে জান দিয়েছিলেন, আমাদের ধর্মীয় নেতারা দোয়ার পর পোলাও কোর্মা খেতে যান। ঐ দোয়া ও এই দোয়া আসমান যমিনের তফাৎ।

লেখক: শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক, হেযবুত তওহীদ

দুনিয়াবিমুখ ধার্মিকতা ইসলামের শিক্ষা নয়

কামরুল ইসলাম

ইসলামকে যারা ব্যক্তিগত জীবনের আচার-অনুষ্ঠানের বাইরে কল্পনা করতে পারেন না, ইসলামের যুগোপযোগিতা ও বাস্তব দুনিয়ায় এই দীনের প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করতে পারেন না তাদের একটি ধারণা হলো- দুনিয়ায় শান্তি বা অশান্তি বিরাজিত থাকার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। তাদের দৃষ্টিতে দীন ও দুনিয়া আলাদা। দীন হচ্ছে নামাজ, রোজা ইত্যাদি করে সওয়াব কামাই করা- যার উদ্দেশ্য কেবলই পারলৌকিক মুক্তি। আর দুনিয়া হচ্ছে খাওয়া, পরা, চিকিৎসা, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি, অর্থনীতি, আইন-কানুন, বিচার ইত্যাদি। এই দীন ও দুনিয়ার পৃথকীকরণে চূড়ান্ত পরিণতি হয়েছে এই যে, সারা পৃথিবী আজ অন্যায়, অবিচার, নির্যাতন, নিপীড়ন, শোষণ, রক্তপাতে ভরে গেছে, কিন্তু সেই অন্যায় অবিচার থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়ার স্বাভাবিক মানবিক আবেদনটুকুও দুনিয়াবিমুখ ধার্মিকরা অনুধাবন করতে পারছেন না। অথচ ইসলামের প্রকৃত আকীদা হচ্ছে- যুগে যুগে আল্লাহ দীন পাঠিয়েছেন মানুষের ইহজাগতিক শান্তির লক্ষ্যেই। বস্তুত মানবজাতির ইহজাগতিক শান্তির উপরই নির্ভর করে মানুষের পারলৌকিক মুক্তি। বিষয়টা ব্যাখ্যা করছি।

মানুষ সৃষ্টির সূচনালগ্নে আল্লাহ যখন মালায়েকদের ডেকে বললেন আমি পৃথিবীতে আমার খলিফা সৃষ্টি করতে চাই (বাকারা ৩০), তাতেই মালায়েকরা বুঝে গেল আল্লাহ ততাঁরর খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে যে সৃষ্টিটি আল্লাহ করতে চাচ্ছেন তার মধ্যে নিশ্চয়ই আল্লাহর রূহ থাকবে, আর যার মধ্যে আল্লাহর রূহ থাকবে তার মধ্যে আল্লাহর অন্যান্য সিফত বা গুণগুলোর মতো স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিও চলে আসবে। সে ইচ্ছা হলে আল্লাহর হুকুম মানবে, ইচ্ছা না হলে মানবে না। মানলে তো ভালোই, কিন্তু অমান্য করলে অশান্তি ও রক্তপাতে পতিত হবে। তাই মালায়েকরা একটু আপত্তির সুরে বলল- তারা তো পৃথিবীতে ফাসাদ (অন্যায়-অশান্তি) ও সাফাকুদ্দিমা (রক্তপাত) করবে। (বাকারা ৩০)

মালায়েকদের এই কথাটির মধ্যেই মানবজাতির ইতিহাসের বিরাট রহস্যটি লুকিয়ে আছে। খেয়াল করলে দেখা যাবে সেই আদম (আ.) থেকে আজ পর্যন্ত মানবজাতির প্রধান সমস্যাই ছিল এই অন্যায়-অশান্তি-রক্তপাত, যার আশঙ্কা মালায়েকরা করেছিল। যাহোক, আল্লাহ বললেন- আমি যা জানি তোমরা তা জানো না (বাকারা ৩০)। তারপর আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করলেন। আদমের মধ্যে রূহ ফুঁকে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন সেই সৃষ্টিটি হয়ে গেল আল্লাহর অসংখ্য সৃষ্টির মধ্যে উচ্চতা, মাহাত্ম্য, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের দিক দিয়ে অনন্য। আল্লাহর হুকুমে সমস্ত মালায়েক আদমকে সেজদাহ করল, কেবল ইবলিশ অংহকার করে সেজদাহ করল না (হিজর ২৯-৩১)। শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ যখন ইবলিশকে বিতাড়িত ও অভিশপ্ত করলেন তখন ইবলিশ আল্লাহর কাছে চ্যালেঞ্জ করল যে, তুমি যদি আমাকে শক্তি দাও আমি মাটির তৈরি তোমার ঐ সৃষ্টির দেহের, মনের ভেতর প্রবেশ করতে পারি তবে আমি প্রমাণ করে দেখাব যে, ঐ সৃষ্টি তোমাকে অস্বীকার করবে, আমি তাদেরকে বিপথগামী করব (হিজর ৩৯, নিসা ১১৮-১১৯), আমি যেমন এতদিন তোমাকে প্রভু স্বীকার করে তোমার আদেশ মতো চলেছি, এ তা চলবে না। আল্লাহ ইবলিশের এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন এবং আদমকে পৃথিবীতে পাঠাবার সময় স্পষ্টভাবে বলে দিলেন যে, তিনি তাঁর পক্ষ থেকে বনি আদমের জন্য হেদায়াহ বা দিক-নির্দেশনা পাঠাবেন, যারা তার অনুসরণ করবে তাদের কোনো ভয় নেই (বাকারা ৩৮)। কীসের ভয় নেই? ঐ যে মালায়েকরা (যাদের মধ্যে ইবলিশও ছিল) বলেছিল মানুষ পৃথিবীতে অন্যায়-অশান্তি ও রক্তপাত সৃষ্টি করবে- সেই অন্যায় অশান্তি রক্তপাত এবং পরকালে জাহান্নামের ভয় নেই। আর যারা আল্লাহর পাঠানো হেদায়াহ অস্বীকার করবে তারা পৃথিবীতে যেমন ফাসাদ ও সাফাকুদ্দিমায় পতিত হবে, পরকালে জাহান্নামে জ্বলবে (বাকারা ৩৯)।

এ কারণে আল্লাহ যুগে যুগে ততাঁরর নবী-রসুলদের মাধ্যমে যে দীন মানুষের জন্য পাঠিয়েছেন তার নাম রেখেছেন ইসলাম, বাংলায় শান্তি। দ্বীনের নাম 'শান্তি' রাখা হয়েছে, কারণ এই দীন প্রয়োগ করলে মানবজীবনে নেমে আসবে অনিবার্য শান্তি। যে ফাসাদ ও সাফাকুদ্দিমার আশঙ্কা মালায়েকরা করেছিল এবং ইবলিশ আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ করেছিল যে, সে হেদায়াহ থেকে সরিয়ে বনি আদমকে বিপথগামী করে ঐ

ফাসাদ ও সাফাকুদ্দিমায় পতিত করবে, সেই ফাসাদ ও সাফাকুদ্দিমার হাত থেকে মানুষ রক্ষা পাবে। আর এটাই আল্লাহর অভিপ্রায়। কেননা পৃথিবীতে ফাসাদ ও সাফাকুদ্দিমা না থাকার মানে ইবলিশের চ্যালেঞ্জে আল্লাহর জয়। আর ফাসাদ ও সাফাকুদ্দিমা থাকার মানে ইবলিশের জয়। মানুষের দায়িত্বটা (এবাদত) হচ্ছে তারা আল্লাহর দেওয়া দিক-নির্দেশনা মোতাবেক পৃথিবীকে পরিচালনা করে ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত রেখে আল্লাহকে জয়ী করবে। আল্লাহ যে বললেন ‘পৃথিবীতে খলিফা পাঠাব’- খলিফার কাজ কিন্তু এটাই, শান্তি প্রতিষ্ঠিত করে আল্লাহকে জয়ী করা।

ইসলামের ভিত্তি হচ্ছে তওহীদ। তওহীদ অস্বীকার করা তো যাবেই না, তওহীদে কোনো অংশীদারিত্ব স্থাপন করাও শিরক, ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। এগুলো সবারই জানা। কিন্তু তওহীদের ব্যাপারে এই কড়াকড়ির কারণটা কি আমরা জানি? কারণটা হচ্ছে ঐ ‘শান্তি’। আল্লাহ জানেন তর্তাঁরর হুকুম অমান্য করলে মানবজাতি অনিবার্য ফাসাদ ও সাফাকুদ্দিমায় পতিত হবে। যেহেতু আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ বা হুকুমদাতা হিসেবে না মানলে শান্তি আসবে না, আল্লাহ বিজয়ী হবেন না, সে কারণেই তওহীদের উপর এত কড়াকড়ি। এই কড়াকড়ি মানুষের ভালোর জন্য, মানুষের পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণের জন্য, মানুষের শান্তির জন্য। সুতরাং পৃথিবীকে অশান্তিতে রেখে, সেই অশান্তি দূর করার প্রচেষ্টা না করে, দুনিয়াবিমুখ আত্মকেন্দ্রিক-স্বার্থপরের মতো বেঁচে থেকে ও ব্যক্তিগত জীবনে কিছু উপাসনা, ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা করেই আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের আশা করেন যারা তারা কতটুকু বাস্তবসম্মত চিন্তাভাবনা করেন তা ভেবে দেখা উচিত।

লেখক: সহকারী সাহিত্য সম্পাদক, দৈনিক বজ্রশক্তি

মানব কল্যাণই ইসলামের উদ্দেশ্য

সমাজে শান্তি স্থাপনের নামই ইসলাম।

যুগে যুগে নবী রসুলগণ তওহীদের উপর ভিত্তি করে সেই শান্তিময় সমাজই গঠন করে গেছেন। তাই আসুন আমরাও শেষ রসুলের (স.) দেখানো পথে সেই শান্তিময় সমাজ গড়ে তুলি।

বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন, আমাদের ফেইসবুক পেজে-

/ASUN.SYSTEM.TAKEI.PALTAI

সরাসরি স্ক্যান করে ভিজিট করুন